লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩০ আশ্বিন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ২৪ মহররম, ১৪৩৮ হিজরি | ১৫ ইখা, ১৩৯৬ হি. শা. | ১৫ অক্টোবর, ২০১৭ ঈসাব্দ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত

‘শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া’

পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

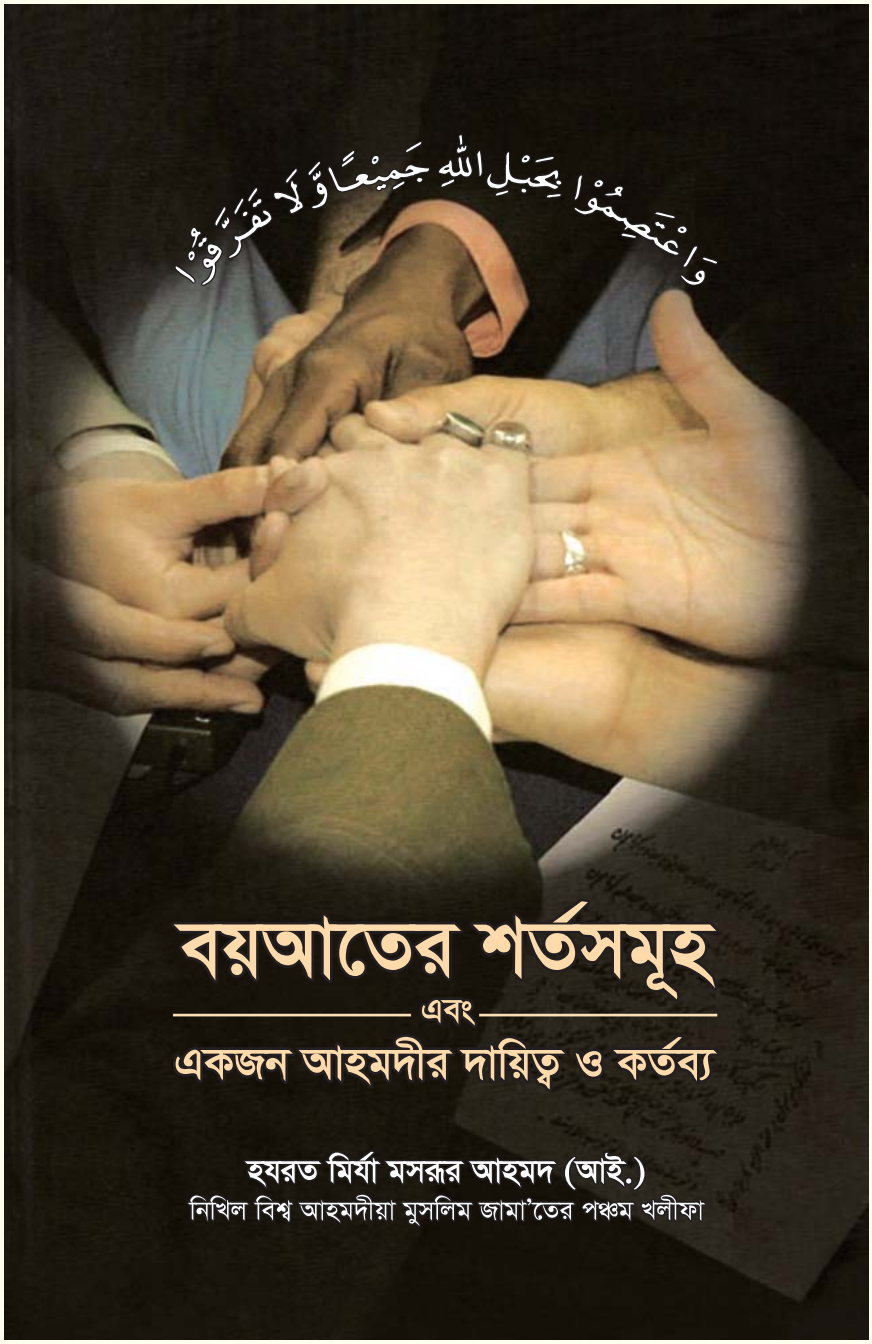

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি ‘গাইড বুক’ বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা’লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত,
বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি?
প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

সম্পাদকীয়

উত্তম মানুষঃ মানবতার সেবায় নিয়োজিত হওয়ার পূর্ব-শর্ত

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে । তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাক এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করে থাক...। (৩:১১১)

এই মানুষগুলো উত্থিত হয়েছিল প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের বর্বর এবং পাশবিক এক সমাজ থেকে, যাদের মাঝে কেবলমাত্র শক্তিশালীরাই টিকে থাকত দোর্দণ্ডপ্রতাপে আর দুর্বলরা হতো শোষিত-বঞ্চিত। দরিদ্র ও অনাথদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, নারীদের না ছিল মানবীয় বা আইনগত কোন অধিকার, বরং তারা ছিল ক্রীতদাসদেরই মত। ইসলামের পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাব তাদেরকেই সর্বোত্তম জাতিসত্তায় পরিবর্তন করে জগতে এক সুমহান বিপ্লব সংঘটিত করেছে, সমগ্র মানবকূলকে পরম মমতায় ঐক্যের বাঁধনে আত্মস্থ করে নিয়েছে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা আর মহানবী (সা.)এর কষ্টিপাথর-রূপ পরশে বর্বর সেই মানুষেরাই বনে গেছে সোনার মানুষ, হয়ে ওঠেছে খোদাপ্রাপ্ত মানুষ।

মানবিক আচরণগত শিক্ষা প্রদানে কুরআনী শিক্ষাঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না। আর পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর। আর নিকটাত্মীয়, এতীম, অভাবী, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গীসহচর, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্তদের সাথেও (সদয় ব্যবহার কর)। নিশ্চয়ই অহংকারী ও দাম্ভিককে আল্লাহ পছন্দ করেন না (৪:৩৭)

'সদকা' কেবল অভাবী, অসহায় এবং (সদকার কাজে নিয়োজিত) কর্মচারীদের প্রাপ্য। আর (এ সদকার অর্থ তাদেরও প্রাপ্য) যাদের অন্তরকে ধর্মের প্রতি অনুরাগী করা প্রয়োজন। আর দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের (ঋণমুক্তির জন্য) এবং আল্লাহর পথে সাধারণ ব্যয় নির্বাহের ও মুসাফিরদের জন্যও (এ সদকার অর্থ খরচ করা যাবে)। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাবান। (৯:৬০)

একদলকে তিনি হেদায়াত দিয়েছেন এবং আরেকটি দলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত করেছেন। নিশ্চয় এরাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং এরা নিজেদের হেদায়াতপ্রাপ্ত মনে করে। (৭:৩২)

তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। আর তোমরা নিজেদের কল্যাণার্থে যে ভালো কাজই ভবিষ্যতের জন্য করবে তা (অর্থাৎ প্রতিদান) তোমরা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা-ই কর নিশ্চয় আল্লাহ এর সর্বদ্রষ্টা। (২:১১১)

পবিত্র মহান গ্রন্থ আল্-কুরআনের উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) মানবতার অধিকার প্রদানের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে দিকদর্শী নির্দেশনা দিয়ে বলেন, **নিছক ইবাদতের নামই তাক্বওয়া নয়, শুধু জামাতের সেবা করার নাম তাক্বওয়া নয়, শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ করার নামও তাক্বওয়া নয়, কেবলমাত্র মসীহ্ মওউদ (আ.) ও খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের নাম তাক্বওয়া নয় বরং তাক্বওয়া পূর্ণতা পাবে তখন, পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, স্বামী-সন্তান, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, জামাতের সদস্য, এমনকি শত্রুর প্রাপ্য অধিকারও যখন প্রদান করা হবে। আর এসব অসামান্য শিক্ষা পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে।** (খুতবা জুমুআ, ১ জুন ২০১২)

আসুন, মানবিক সেবায় উজ্জীবিতকারী যুগ-খলীফার এই আহ্বানে আমরা সবাই সাড়া দিয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে নিজেদের নিয়োজিত করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দান করুন। আমীন!

সূচিপত্রে

৩০ সেপ্টেম্বর ও ১৫ অক্টোবর, ২০১৭

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' (৩য় খণ্ড) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

এযালায়ে আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১৩
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ জানুয়ারি, ২০১৭ **জুমুআর খুতবা** ১৭

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ **জুমুআর খুতবা** ২৫

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ৩১
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

কলমের জিহাদ ৩৩
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

তাহরীকে জাদীদঃ জিহাদ বিল মা'ল কল্যাণমণ্ডিত মহান এক ঐশী পরিকল্পনা ৩৫
মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ৩৮
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

স্মৃতিচারণ– **পানাউল্লাহ্ সাহেবের আহমদীয়াত জীবন** ৪১
নূরজাহান বেগম

মহিষাখোলায় মসজিদ নির্মাণের জন্য নওমুবাঈনদের ঈমান-উদ্দীপক প্রচেষ্টা ৪৩
মওলানা শোয়েব আহমদ খন্দকার

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার ৪৫
লাকী আহমদ

সংবাদ ৪৭

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ গত ১৩ অক্টোবর ২০১৭, দারুত তবলিগ কেন্দ্রীয় মসজিদে স্থানীয় জামা'ত সমূহের আমীর, প্রেসিডেন্ট ও কর্মকর্তাগণকে তালিম, তরবিয়্যত ও তবলিগী কার্যক্রমের উপর দিক-নির্দেশনা প্রদান করছেন।

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন–
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝٢

৩। আর আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। আর আমরা এটিকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম (এবং নির্দেশ দিয়েছিলাম,) 'তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে (তোমাদের) কার্যনির্বাহকরূপে গ্রহণ করবে না।'

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝٣

৪। (এরা ছিল) তাদের বংশধর, যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল আমাদের একজন পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝٤

৫। আর আমরা সেই কিতাবে বনী ইসরাঈলকে একথা (সুস্পষ্টভাবে) জানিয়ে দিয়েছিলাম, 'তোমরা অবশ্যই পৃথিবীতে দু'বার[১৫৯২] নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে। আর তোমরা অবশ্যই চরম ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয়ে প্রাধান্য লাভ করবে।'

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۭ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝٥

৬। অতএব দুটি প্রতিশ্রুতির প্রথমটি[১৫৯৩] পূর্ণ হবার সময় যখন এলো তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বান্দাকে পাঠালাম যারা (ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে) জনবসতির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো। আর এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া ছিল অবধারিত।

১৫৯২। হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাবে (দ্বিতীয় বিবরণ-৮:১৫, ৪৯-৫৩, ৬৩-৬৪ এবং ৩০:১৫) ইসরাঈল জাতি কর্তৃক দু'বার সীমালঙ্ঘন করার কথা বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা অস্বীকার করেছিল তারা হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) কর্তৃক দু'বার অভিশপ্ত হয়েছিল (৫:৭৯)। ফলে দু'বারই তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল।

১৫৯৩। হযরত দাউদ (আ.)-এর পরে ইসরাঈল জাতিকেও প্রথমে দৈব দুর্বিপাক গ্রাস করেছিল এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর পরে তাদের উপর দ্বিতীয়বার শাস্তি এসেছিল। বাইবেল থেকে প্রতীয়মান হয়, ইহুদীরা হযরত মূসা (আ.)-এর পরে খুবই শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। দাউদ (আ.)-এর সময়ে তারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেও তারা ক্ষমতা ও গৌরবে উন্নতি করতে থাকে। পরবর্তীকালে এ রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে অবনতির শিকারে পরিণত হয় এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৭৩৩ অব্দে সামারিয়া বিজিত হয় অ্যাসিরিয়ানদের দ্বারা, যারা জেযরিলের উত্তর অংশের ইহুদী রাজ্যের সম্পূর্ণ অংশ দখল করে নেয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৮ সালে ফেরাউন নিকো এর মিশরীয় সৈন্যবাহিনী কর্তৃক প্যালেস্টাইন লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয় এবং ইসরাঈলীরা মিশরীয় শাসনাধীনে চলে যায় (যিউ এনসাইক, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬৬৫)।

[টিকার অবশিষ্টাংশ ২৪ পৃষ্ঠায়]

হাদীস শরীফ

পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

কুরআনঃ

"মূর্তিপূজার শির্‌ক থেকে তোমরা বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" (সূরা হজ্জ : ৩১)

হাদীসঃ

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের তিনটি বড় গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন, তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, সোজা হয়ে তিনি বসলেন এবং বললেন, খবরদার মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো। তিনি (সা.) এ কথাটি পুণঃ পুণঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! তিনি (সা.) যদি চুপ করে যেতেন" (বুখারী)।

ব্যাখ্যাঃ

মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তা ইসলাম পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা, মিথ্যাচারিতা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া– এ তিনটি বড় গুনাহ্, যা মানুষকে খোদা থেকে দূরে এবং খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয় তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাণদাতা ও মা'বুদ মনে করে। এজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাও বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং মিথ্যা বলা থেকে সকলকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবনযাত্রার সব সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আর আমাকে আমার আমিত্বের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিমুখে নিয়ে গেছেন। জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্বিবলায় পৌঁছলাম এবং তাঁর মনোনীত গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র স্নেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করল, তখন আমি আমার পূর্ণ অস্তিত্ব তাঁর হাতে সঁপে দিলাম।

আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্মবিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে ব্যুৎপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আমি সব বিতর্কের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কোন ক্ষেত্র বাদ রাখিনি, বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, **বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুলভ্রান্তি করছে, একটি দিক উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিক অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্খিত কোন কিছুর ভালবাসায় মত্ত হলে প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে– এই হলো মানবস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না, বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শত্রু মনে করে। তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তখন সে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না।**

আত্মিক এ বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পন্থা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপে আসক্তি, পরকালে জবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শত্রুদের সাথে সখ্যতা। অজ্ঞতা মানব জীবনে বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতন্ডার সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যান্বেষী ও হেদায়াত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কু-প্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচ্ছন্ন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। তড়িঘড়ি করে যখন সে বিতন্ডায় লিপ্ত হয় আর বিবাদ-বিসম্বাদে ক্রমশ: উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড় জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ।

['সির্‌রুল খিলাফাহ্‌' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৩-১৪]

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

৩য় খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

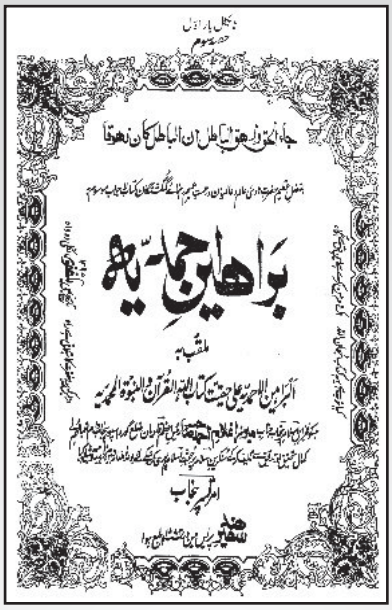

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(৩৫তম কিস্তি)

ষষ্ঠ সন্দেহ: পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের মাধ্যম তা হতে পারে, যা সর্বদা সব যুগে সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। অতএব, প্রকৃতিরূপী গ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্য, যা সদা উন্মুক্ত - কখনও বন্ধ হয় না, আর এটিই পথপ্রদর্শক হওয়ার যোগ্য। এর কারণ হলো, এমন কোন কিছু পথপ্রদর্শক হতে পারে না, যার দরজা অধিকাংশ সময় বন্ধই থাকে, কেবল কোন বিশেষ যুগে খোলে!

উত্তর: প্রকৃতি-রূপী গ্রন্থকে ঐশী বাণী বা ঐশী গ্রন্থের সাথে একই মানদণ্ডে উন্মুক্ত মনে করাই চোখ বন্ধ হওয়ার প্রমাণ। যাদের হৃদয়-চক্ষু ও বাহ্যিক চক্ষুতে কোন ত্রুটি নেই, তারা খুব ভালোভাবে জানে যে, কেবল সে গ্রন্থকেই উন্মুক্ত আখ্যা দেয়া হয়, যার লেখা পরিষ্কারভাবে চোখে পড়ে আর যা পাঠ করলে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু কে প্রমাণ করতে পারবে যে, নিছক প্রকৃতিরূপী গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমেই কোনকালে কারো সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে? কে বলতে পারে যে, প্রকৃতি-পূজার লেখনী কাউকে কখনও কোন গন্তব্যে পৌঁছিয়েছে? কে দাবী করতে পারে যে, আমি প্রকৃতিরূপী গ্রন্থের সব যুক্তি-প্রমাণ পুরোপুরি আয়ত্ত করে ফেলেছি। এটি যদি খোলা গ্রন্থ হতো, তাহলে যারা এর ওপর নির্ভর করতো, তারা কেন সহস্র-সহস্র ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হলো? আর একই গ্রন্থ পাঠ করে এরা কেন পরস্পর এত ভিন্ন ভিন্ন মতে উপনীত হতো যে, খোদার অস্তিত্বে একজন কিছুটা বিশ্বাস করলেও অপরজন পুরোপুরি অস্বীকারকারী? কথার কথা হিসেবে যদি আমরা এটি ধরেও নেই যে, এই গ্রন্থ পাঠ করে যে ব্যক্তি খোদার সত্তাকে আবশ্যক মনে করে নি, সে এতটা আয়ুস্কাল অবশ্যই লাভ করবে যে, একদিন হয়ত নিজের ভুল বুঝতে পারবে; কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি এটি উন্মুক্ত গ্রন্থ হয়ে থাকে, তাহলে এটি দেখেও বড় বড় এত ভুল কেন হলো? আপনার মতে কি একেই খোলা গ্রন্থ বলা হয়, যার পাঠক খোদার সত্তা সম্পর্কেই মতভেদ রাখবে আর বিসমিল্লাহ্‌তেই গলদ? এটি কি সত্য নয় যে, প্রকৃতিরূপী এই গ্রন্থ পাঠ করে সহস্র সহস্র জ্ঞানী ও দার্শনিক, নাস্তিক ও প্রকৃতি পূজারী হিসেবে ইহধাম ত্যাগ করেছে বা প্রতিমার সামনে করজোড়ে আকুতি-মিনতি করতে থাকে। আর তাদের মধ্য হতে কেবল সে ব্যক্তিই সঠিক পথে ফিরে এসেছে, যে ঐশী বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

একথায়, মিথ্যার কোন মিশ্রণ আদৌ আছে কি যে, কেবল এই গ্রন্থের পাঠক, যারা বড় বড় দার্শনিক আখ্যায়িত হয়েও সচেতন পরিকল্পনাকারী, সুপরিকল্পনাকারী স্রষ্টা ও অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞাত–হিসেবে খোদাকে অস্বীকার করে আসছে আর অস্বীকারকারী-রূপেই ইহধাম ত্যাগ করেছে? খোদা কি তোমাদের এতটা বোধ-বুদ্ধিও দেননি যে, যে পত্রের বিষয়বস্তুকে যদু কিছু মনে করে আর মধু ভাবে অন্যকিছু, অথচ খালেদ তাদের উভয়ের বিপরীতে ভিন্ন কোন ধারণা পোষণ করলে, সে পত্রের লেখা বা বিষয়বস্তু খোলা ও স্পষ্ট আখ্যায়িত হয় না বরং সন্দেহযুক্ত, ঘোলাটে ও অস্পষ্ট আখ্যা পায়। এটি এমন কোন সূক্ষ্ম রহস্যাবৃত কথা

নয় যা বুঝার জন্য সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রয়োজন হয় বরং এ এক অতি প্রাঞ্জল সত্য। কিন্তু তাদের কী চিকিৎসা করা যাবে, যারা একতরফা অন্ধকারকে আলো আর আলোকে অন্ধকার আখ্যা দেয় আর দিনকে রাত এবং রাতকে দিন আখ্যায়িত করে?

একটি শিশুও বুঝতে পারে যে, মনের কথা পুরোপুরি বলার জন্য খোদার পক্ষ থেকে যে সঠিক রাস্তা নির্ধারিত আছে, তাহলো কথার মাধ্যমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা। কেননা, মনের ইচ্ছা প্রকাশের জন্য বাকশক্তিই হলো মাধ্যম আর এই মাধ্যমকে কাজে লাগিয়েই এক ব্যক্তি অন্যের হৃদয়ের কথা জানতে পারে। প্রত্যেক এমন বিষয়, যা এর মাধ্যমে বোঝানো না হয়, তা পূর্ণ বোধগম্যতার স্তর হতে নীচের স্তরেই থেকে যায়। সহস্র সহস্র এমন বিষয় আছে যে, প্রকৃতিগত যুক্তির নিরিখে যদি আমরা সে সব বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই, তা অসম্ভব ঠেকে আর চিন্তাভাবনার জোরে সিদ্ধান্ত করতে গেলেও ভুল করে বসি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এটি জানা কথা যে, খোদা চোখ সৃষ্টি করেছেন দেখার জন্য আর কান শোনার জন্য, জিহ্বা কথা বলার জন্য; এসব অঙ্গের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ওপর দৃষ্টিপাতে এতটুকু আমরা উদঘাটন করলাম।

কিন্তু প্রকৃতিগত এই যুক্তিকেই যদি আমরা সবকিছু মনে করি আর ঐশী বাণীর ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করি, তাহলে প্রকৃতিগত যুক্তি-প্রমাণের নিরিখে আমাদের নীতি এই হওয়া উচিত যে, হালাল-হারামের পার্থক্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা, মন যা চায় তা শুনা, বা মুখে যা আসে তাই বলে দেয়া কেননা, প্রকৃতির নিয়ম আমাদেরকে এতটুকু বুঝায় যে, চোখ দেখার জন্য, কান শোনার জন্য আর জিহ্বা কথা বলার জন্য সৃষ্টি হয়েছে! আর তা আমাদেরকে এ প্রকাশ্য প্রতারণায় নিমগ্ন করে যে, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি বা বাকশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা যেন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও সকল বিধি-বিধানের উর্ধ্বে।

এখন ভেবে দেখা উচিত, ঐশীবাণী যদি প্রকৃতির নিয়মের রহস্যাবলী উন্মোচন না করে, আর এর অস্পষ্টতাকে স্বীয় সুস্পষ্ট কথা ও পরিষ্কার বক্তব্যের মাধ্যমে দূরীভূত না করে, তাহলে কতইনা বিপদাপদ রয়েছে! নিছক প্রকৃতির নিয়মের দাসত্ব করলে,এর গ্রাসে পরিণত হওয়ার আশংকা স্পষ্টতই বিদ্যমান। এটি খোদারই বাণী বা গ্রন্থ, যা প্রকাশ্য ও অতি স্পষ্টশিক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে আমাদের সব কথা ও কর্মে গতি ও স্থিতিতে নির্দিষ্ট ও সুবিদিত সীমারেখার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে আর মানবিক শিষ্টাচার ও পবিত্র আলো লাভের উপায় শিখিয়েছে। চোখ, কান ও জিহ্বা, ইত্যাদি অঙ্গের সুরক্ষার জন্য গভীর তাগাদা দিয়ে তিনিই বলেছেন।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ

(সূরা আন্ নূর:৩১) অর্থাৎ, মু'মিনদের উচিত, স্বীয় চোখ, কান ও লজ্জাস্থান না-মাহরামদের কবল থেকে সুরক্ষিত রাখা আর সকল অদর্শনীয়, অশ্রবণীয় আর অকরণীয় বিষয় থেকে বিরত থাকা। কেননা, এ পন্থা তাদের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার কারণ হবে, অর্থাৎ তাদের হৃদয় প্রবৃত্তির হরেক প্রকার তাড়না হতে মুক্ত থাকবে। কেননা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব অঙ্গই প্রবৃত্তির কামনা-বাসনায় সুড়সুড়ি দেয় আর পাশবিক শক্তিবৃত্তিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে।

দেখুন! না-মাহরামদের কবল হতে বেঁচে চলার বিষয়ে পবিত্র কুরআন কত গভীর তাগাদা দিয়েছে আর কত স্পষ্টভাবে বলেছে যে, বিশ্বাসীরা নিজেদের চোখ, কান ও লজ্জাস্থানকে যেন নিয়ন্ত্রণে রাখে, আর অপবিত্রতার আশংকা থাকে এমন স্থান-কাল বা পরিস্থিতি এড়িয়ে চলে। অনুরূপভাবে, জিহ্বাকে সত্য ও সঠিক পথে রাখার জন্য তাগাদা দিয়েছে আর বলেছে,

وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

(সূরা আল্ আহযাব: ৭১) অর্থাৎ, সে কথা বল, যা পুরোপুরি সত্য ও একান্ত যুক্তিযুক্ত। বাজে, বৃথা ও মিথ্যা কথার যেন লেশমাত্র এতে না থাকে। এছাড়া সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অবিচলতার সাথে সঠিক ও নির্ধারিত কাজে নিয়োজিত রাখার জন্য এমন এক সম্পূর্ণ ও হুমকীসূচক কথা, সাবধানবাণী ও সতর্কবাণীস্বরূপ উল্লেখ করেছেন, যা উদাসীনদেরকে সতর্ক করার জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেছেন,

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

(সূরা বণী ইস্রাঈল:৩৭) অর্থাৎ, কান, চোখ ও হৃদয়, অনুরূপভাবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তিনিচয় যা মানুষের রয়েছে, এ সবের অযথা ব্যবহার করলে জবাবদিহি করতে হবে আর সকল ব্যতিক্রম ও কমতি-বাড়তির জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।

এখন দেখ! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সকল শক্তি-বৃত্তিকে সঠিক ও কল্যাণকর স্থানে কাজে লাগানোর জন্য কত বিশদ ব্যাখ্যা ও তাগিদ খোদার কালাম বা গ্রন্থে বিদ্যমান! আর সব অঙ্গকে পরম ভারসাম্যের ওপর ও সঠিক ভাবে কার্যকর রাখার জন্য বিশদ ব্যাখ্যার সাথে কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা (অপ্রয়োজনীয়) সংক্ষিপ্ততা অবশিষ্ট নেই। প্রশ্ন হলো, এমন সবিস্তার বিবরণ ও বিশদ ব্যাখ্যা প্রকৃতিরূপী (তথাকথিত) গ্রন্থের কোন পৃষ্ঠা পাঠে জানা যায় কি? মোটেই নয়।

সুতরাং, এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর যে, খোলা ও স্পষ্ট গ্রন্থ এটি, না সেটি? প্রকৃতিগত নিদর্শনের প্রজ্ঞা ও সীমা-পরিসীমা এটি বর্ণনা করেছে, না-কি সেটি? সম্মানিত পাঠকগণ! ইঙ্গিতেই যদি কাজ চলতো, তাহলে মানুষকে ভাষা কেন দেয়া হয়? তোমাদেরকে যিনি ভাষা দিয়েছেন, তিনি কি কথা বলার ক্ষমতা রাখেন না? যিনি তোমাদের কথা বলা শিখিয়েছেন, তিনি নিজে কি কথা বলতে পারেন না? স্বীয় কর্মের মাধ্যমে যিনি এই ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন যে, এত বড় বিশ্ব আকৃতি-যুক্ত কোন বস্তুর সাহায্য ছাড়া এবং কোন রাজমিস্ত্রি, শ্রমিক ও কাঠমিস্ত্রির সাহায্য না নিয়ে কেবল ইচ্ছার বলে সৃষ্টি করেছেন; তাঁর সম্পর্কে এ কথা বলা বৈধ হতে পারে কি যে, তাঁর কথা বলার শক্তি নেই বা শক্তি আছে ঠিকই তবে কার্পণ্যের কারণে স্বীয় উক্তির কল্যাণ হতে মানুষকে বঞ্চিত রেখেছেন? সর্বশক্তিমান সম্পর্কে এমন ধারণা রাখা বৈধ হতে পারে কি, যে তিনি আপন শক্তিমত্তার (প্রকাশের) ক্ষেত্রে পশুর চেয়েও অধম।

কেননা, নিম্ন প্রজাতির একটি প্রাণীও নিজস্ব ধ্বনি বা কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে অন্য প্রাণীদেরকে নিজ অস্তিত্ব জানান দিয়ে থাকে, একটি মাছিও নিজের ভনভনানির মাধ্যমে অন্য মাছিকে নিজের আগমন সম্পর্কে অবহিত করতে পারে, কিন্তু নাউযুবিল্লাহ্! তোমাদের কথা অনুসারে সর্বশক্তিমান এই খোদার মাঝে একটি মাছি-পরিমাণ শক্তিও নেই। যেখানে তাঁর সম্পর্কে তোমাদের স্পষ্ট উক্তি রয়েছে যে, তার মুখ কখনও খোলেনি আর কখনও কথা বলার শক্তিও তার হয়নি; এমন ক্ষেত্রে তোমাদের বলা উচিত, সে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ, যার অন্যান্য শক্তির কথা তো জানা আছে কিন্তু তাঁর বাকশক্তি আছে বলে কোনদিন প্রমাণ পাওয়া যায়নি! তার সম্পর্কে তোমরা কীভাবে বলতে পার যে, তিনি কোন খোলা গ্রন্থ তোমাদেরকে দিয়েছেন, যাতে তিনি সবিস্তারে আপন মনের ভাব প্রকাশ করে থাকবেন। বরং তোমাদের মতামতের সারাংশই হলো, খোদা যে পথের দিশা দিয়েছেন, তাতে কোন কাজ হয় নি, সত্যিকার অর্থে স্বীয় যোগ্যতা ও সামর্থের গুণে তোমরা তাকে চিনেছ।

অধিকন্তু, ঐশী শিক্ষা এ অর্থে উম্মুক্ত বা খোলা হয়ে থাকে যে, এর প্রভাব সচরাচর সবার হৃদয়ে পড়ে আর সকল প্রকার প্রকৃতি এর দ্বারা কল্যাণমন্ডিত হয়, বিভিন্ন ধরণের ফিতরত বা স্বভাব তা হতে উপকৃত হয় আর সকল প্রকার সন্ধানীর জন্য এর মাধ্যমে সাহায্য লাভ হয়। এ কারণেই ঐশী বাণীর মাধ্যমে অনেকেই সঠিক পথের দিশা পেয়েছে এবং পায়। আর নিছক যৌক্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে অতি অল্পই পথের দিশা পায় বরং তা না হওয়ারই মত। আর কিয়াস বা ধারণাও চায় যে, এমনই হোক। কেননা, এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি মানুষের সামনে সত্য সংবাদ দাতা প্রমাণিত হয়ে পরকাল সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং দেখা ও শুনা বিষয়াদি বর্ণনা করে আর এর পাশাপাশি যৌক্তিক প্রমাণাদিও বোঝায়, সে সত্যিকার অর্থে দ্বিগুণ শক্তি নিজের মাঝে রাখে। কেননা, তার সম্পর্কে প্রধানতঃ এই দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে যে, সে প্রকৃত বিষয় নিজেই প্রত্যক্ষকারী আর সত্যের চাক্ষুস সাক্ষী।

দ্বিতীয়তঃ সত্যের আলো সে যৌক্তিকভাবে ও স্পষ্ট প্রমাণাদিতে সজ্জিত করে প্রকাশ করে। সুতরাং এ দু'টো প্রমাণের সমন্বয়ে তার বক্তৃতা ও উপদেশে একপ্রকার শক্তিশালী আকর্ষণ-শক্তি সৃষ্টি হয়, যা বড় বড় পাষাণ হৃদয়কেও আকর্ষণ করে এবং সকল প্রকার হৃদয়ে দাগ কাটে। কেননা তার উক্তি বিভিন্ন প্রকার কথাকে বিভিন্নভাবে বুঝানোর যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে থাকে, যা বুঝার জন্য কোন নির্দিষ্ট যোগ্যতা বা মেধার শর্ত নেই বরং সম্পূর্ণরূপে কান্ডজ্ঞান বিবর্জিত ব্যক্তি ছাড়া সকল তুচ্ছ-উচ্চ, বিচক্ষণ ও অথর্ব ব্যক্তিও তার বক্তব্য বুঝতে পারে। আর সে তাৎক্ষণিকভাবে সকল শ্রেণীর মানুষকে অবিকল সেভাবে আশ্বস্ত করতে পারে যেমনটি কি-না তাদের স্বভাব বা যেমনটি তাদের শক্তি-সামর্থ্যের দাবী হয়ে থাকে।

তাই, তার উক্তি বা বাণী চিন্তাধারাকে খোদামুখী করা, জাগতিকতার মোহ হতে মুক্ত করা আর হৃদয়ে পারলৌকিক জীবনসংক্রান্ত বিষয়াদী প্রোথিত ও গ্রথিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক শক্তি রাখে। তাঁর কথা সেসকল সংকীর্ণ ও তমসাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণায় সীমাবদ্ধ থাকে না, যাতে নিছক বুদ্ধিপূজারীদের কথাবার্তা সীমাবদ্ধ থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এর কার্যকারিতা বা প্রভাব সার্বজনীন আর এর কল্যাণ বা উপকারিতা হয়ে থাকে পরম মার্গের। আর সকল প্রকার মানুষের হৃদয়-পেয়ালা স্বীয় সামর্থ্য বা পরিমাপ অনুসারে এতে ভরে যায়। স্বীয় পবিত্র গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'লা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন– অর্থাৎ খোদা আকাশ থেকে পানি অর্থাৎ স্বীয় বাণী অবতীর্ণ করেছেন আর সকল উপত্যকা স্ব-স্ব যোগ্যতা অনুসারে অর্থাৎ প্রত্যেকেই তা হতে স্বীয় প্রকৃতি, ধ্যান-ধারণা ও যোগ্যতা অনুসারে অংশ পেয়েছে।

মহান প্রকৃতির মানুষ প্রজ্ঞাপূর্ণ রহস্যাবলী হতে লাভবান হয় আর যেসব প্রকৃতি আরও উন্নত মানের ছিল, তারা বিস্ময়কর এক জ্যোতি লাভ করেছে, যা রচনা ও বক্তৃতার আয়ত্বের উর্ধ্বে। আর যেসব প্রকৃতি নিম্নমানের ছিল, তারা সত্যসংবাদ দাতার মাহাত্ম্য ও ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা দেখে আন্তরিক ভালবাসার সাথে তার সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে; এভাবে তারাও বিশ্বাসের নৌকায় আরোহন করে মুক্তির তীরে পৌঁছে গেছেন। কেবল তারাই বাইরে রয়ে গেছে, খোদা সম্পর্কে যাদের আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না, যারা ছিল নিছক দুনিয়ার কীট। এছাড়া প্রভাব বিস্তারের শক্তির ওপর দৃষ্টিপাতেও এলহাম অনুসরণের রাস্তা অতি প্রশস্ত ও ব্যাপক মনে হয়। কেননা, যাদের জ্ঞান আছে, তারা খুব ভালভাবে জানে যে, বক্তৃতায় আশিষ, আবেগ-উচ্ছাস, শক্তি, মাহাত্ম্য ও আবেদন সে অনুপাতে সৃষ্টি হয়, যতটা বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার উন্নত মানে বক্তা উপনীত থাকে।

সুতরাং, এই পরাকাষ্ঠাও সে ব্যক্তির বক্তব্যে প্রকৃত অর্থেই বিদ্যমান থাকতে পারে, খোদা সম্পর্কে যার দ্বিগুণ তত্ত্বজ্ঞান থেকে থাকে। আর সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে এটি স্পষ্ট যে জোরালো বক্তৃতা, যার ওপর বক্তৃতার কার্যকারিতা নির্ভর করে, তা কেবল তখনই মানুষের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়, যখন দৃঢ় বিশ্বাসের প্রেরণা ও উচ্ছাসে তার হৃদয় পূর্ণ থাকে আর সেসকল কথাই কেবল হৃদয়ে আসন পাতে, যা দৃঢ় বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হৃদয় থেকে আবেগ-উচ্ছাসের সাথে নির্গত। সুতরাং এখানেও এ কথাই প্রমাণিত হলো, গভীর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রেও ইলহামের মাধ্যমে লব্ধ শিক্ষা বা তরবীয়তই দ্বার উন্মোচন করে।

এক কথায়, সার্বজনীন কার্যকারিতার ও প্রভাব বিস্তারের গভীরতার নিরিখে শুধুমাত্র ওহীর গ্রন্থই সম্পূর্ণরূপে উম্মুক্ত ও খোলা থাকা প্রমাণিত সত্য, এ ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। এ কথা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রকাশিত সত্যের চেয়ে কোনভাবেই কম স্পষ্ট নয় যে, খোদার বান্দাদের সবচেয়ে বড় হিতসাধনকারী ব্যক্তি সে-ই হয়ে থাকে যার মাঝে ইলহাম ও বুদ্ধির সমাহার ঘটে আর তার মাঝে এমন যোগ্যতা থাকে, যদ্বারা সকল স্বভাব ও সব প্রকৃতির মানুষ উপকৃত হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল যুক্তিনির্ভর প্রমাণাদির বলে সঠিক পথের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়, তার মাথা খাটানোর ফলশ্রুতিতে কোন ফলাফল প্রকাশ পেলেও তা কেবল সেসব বিশেষ প্রকৃতির লোকদের ক্ষেত্রেই পেতে পারে, যারা সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য-সামর্থবান হওয়ার সুবাদে তার সূক্ষ্ম ও সুগভীর কথাগুলো বুঝবে। অন্যরা তার দর্শনভিত্তিক কথাবার্তা বোঝার মত হৃদয় বা মন-মস্তিষ্কই রাখে না।

তাই, তার জ্ঞানের কল্যাণধারা স্বল্পসংখ্যক সেই লোকদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য, যারা তার যুক্তি সম্পর্কে অবহিত, আর তদ্বারা কেবল তাদেরই লাভ হয়, যারা তার মত যৌক্তিক কথাবার্তা বা বিতর্কে সিদ্ধহস্ত।

যুক্তি ও সত্য ইলহামের কার্যক্রমকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করা হলে এ বিষয়ের প্রমাণ অতি স্পষ্টভাবে পাওয়া সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যারা প্রাচীন বিজ্ঞদের জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত, তারা ভালভাবে জানে যে, স্বীয় শিক্ষা সর্বস্তরে প্রচারে এরা কীভাবে ব্যর্থ হয়েছে আর কীভাবে তাদের অসম্পূর্ণ ও সংকীর্ণ কথাবার্তা বা বক্তৃতা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়েছে। তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের এই অধঃপতিত অবস্থার সাথে কুরআনের উন্নত পর্যায়ের প্রভাব বা কার্যকারিতাকে লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ স্বীয় প্রকৃত অনুসারীদের হৃদয়ে কত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত আর কত বিস্ময়করভাবে এর সুমহান শিক্ষা শত শত বছরের বদ্ধমূল অভ্যাস ও নোংরা প্রবণতাকে নির্মূল করেছে! আর এমন সব প্রাচীন কুপ্রথা, যা দ্বিতীয় প্রকৃতি বা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, তা তাদের শিরা-ধমনী থেকে বের করে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের অমৃতসুধা কোটি কোটি মানুষকে পান করিয়েছে।

সেটিই স্বীয় অসাধারণ সাফল্য এবং অতি উন্নত ও টেকসই ফলাফল প্রকাশ করে আপন অনন্য কার্যকারিতার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের মাধ্যমে বড় বড় শত্রুর কাছ থেকে নিজের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করেছে। এমনকি ঘোরতর অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের মনেও এর এত গভীর প্রভাব পড়েছে যে, এটিকে তারাও কুরআনের মাহাত্ম্যের প্রমাণ বলে স্বীকার করেছে আর অবিশ্বাসে অনড় ও অটল থাকা সত্ত্বেও অবশেষে তাদেরকেও বলতে হয়েছে যে,

إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

(সূরা আস্ সাফ্‌ফাত:১৬) অর্থাৎ এটাতো কেবল এক সুস্পষ্ট যাদু। হ্যাঁ, এটি তাই, যার সুগভীর আবেদন বা আকর্ষণ খোদার প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে যা সচরাচরের তুলনায় সহস্র সহস্র গুণ বেশি। এর কল্যাণে খোদার লক্ষ লক্ষ বান্দা নিজেদের রক্ত দিয়ে তাঁর একত্ববাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

অনুরূপভাবে চিরকাল ধরে ইলহামই এই কাজের গোড়া পত্তনকারী ও পথের দিশারীর ভূমিকা পালন করে আসছে, যার মাধ্যমে মানুষের বিবেকবুদ্ধি ও মেধা উন্নতি করেছে। নতুবা বড় বড় দার্শনিক ও জ্ঞানীদের জন্যও অতি কঠিন বরং অসম্ভব বিষয় যা ছিল, তা হলো অতীন্দ্রিয় বিষয়াদির সকল খুটিনাটি উদঘাটনের এমন সুযোগ সব সময় লাভ করা, যার মাধ্যমে সেই অনুষঙ্গগুলোর অবস্থা-ব্যবস্থা ও বিশেষত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হতে পারে। মানুষের মাঝে যারা স্বল্প বোধবুদ্ধি রাখে বা চেষ্টা-সাধনার জন্য যাদের কোন উপায়-উপকরণ হস্তগত হয় নি, তারা তো এদের (অর্থাৎ,যারা নিজেদেরকে দার্শনিক ও জ্ঞানী ভাবে তাদের) চেয়েও বেশি অজ্ঞ ও অধম। সুতরাং এ সম্পর্কে খোদার সত্য ইলহাম অর্থাৎ পবিত্র কুরআন শরীফ, বিবেক বা বুদ্ধিকে যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে আর যেসব অনিশ্চয়তার অমানিশা থেকে দৃষ্টি ও চিন্তাকে রক্ষা করেছে, তা এমন একটি বিষয় যার জন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

অতএব, সূচনাতে খোদার পরিচয় লাভ হয়েছে ইলহামের মাধ্যমেই-এ দৃষ্টিকোণ থেকে হোক বা এ কারণেই হোক যে, খোদা সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান সদা ইলহামের হাতেই নতুনভাবে জীবন্ত হয়ে আসছে অথবা এ ধারণার নিরিখেই হোক না কেন যে, জীবন-পথের সমস্যা হতে মুক্তি পাওয়া ইলহামের ওপরই নির্ভরশীল– সকল বিবেকবানকে স্বীকার করতে হয় যে, যে পথ অতি স্বচ্ছ ও সোজা আর চির উন্মুক্ত এবং নিশ্চিৎ গন্তব্যে পৌঁছিয়ে থাকে, তা হলো খোদার ওহী। তাই একথা মনে করা যে, এটি উন্মুক্ত বা খোলা গ্রন্থ নয়, সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন ও আহাম্মকের কাজ। এ ছাড়া, ইতোপূর্বে আমরা ব্রাহ্ম সমাজীদের খোদাকে চেনা বা সনাক্ত করা সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছি যে, তাদের নিছক যৌক্তিক প্রমাণাদির ওপর নির্ভরশীল ঈমান কেবল 'হওয়া উচিত বা থাকা উচিত' এর গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ। 'আছে' মর্মে নিশ্চিত ও সুমহান বিশ্বাসের মর্যাদা তাদের ভাগ্যে জোটেনি।

সুতরাং, এসব গবেষণার মাধ্যমেও এটিই প্রমাণিত যে, ঐশীতত্ত্ব লাভের খোলা ও স্পষ্ট পথ কেবল ঐশীবাণী বা খোদার গ্রন্থের মাধ্যমেই লাভ হয়। এ পর্যন্ত পৌঁছা এবং এটি অর্জনের অন্য কোন উপায় নেই। সদ্যজাত এক শিশুকে শিক্ষাবঞ্চিত রেখে কেবল সহজাত প্রকৃতিরূপী গ্রন্থের হাতে ছেড়ে দাও, এরপর দেখ, ব্রাহ্ম সমাজীরা যে গ্রন্থকে উন্মুক্ত মনে করে, তার কল্যাণে সে কোন্ তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে আর খোদাকে চেনার কোন্ পর্যায়ের মানে সে উপনীত হয়। বহু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত যে, যদি কেউ শ্রুতি-মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সংবাদ না পায়, যার ভিত্তি হলো ইলহাম; তাহলে সে বুঝেই উঠতে পারবে না যে, এ বিশ্বের কোন স্রষ্টা আছেন কি না! স্রষ্টার সন্ধানের প্রতি কেউ মনোযোগ নিবদ্ধ করলেও কেবল কতক সৃষ্টি যেমন- পানি, অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য ইত্যাদিকে স্বীয় ধারণা অনুসারে স্রষ্টা ও পুজনীয় আখ্যা দিয়ে বসে, যা সকল যুগে আদিম বন্য লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাতে প্রমাণিত হয়ে আসছে।

অতএব, এটি ইলহামেরই আশিস ও কল্যাণ, যার সুবাদে মানুষ সেই অনন্য ও অতুলনীয় খোদাকে সেভাবে শনাক্ত করেছে, যেমনটি কি না তাঁর সম্পূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত সত্তার জন্য মানানসই। ইলহাম সম্পর্কে যারা অজ্ঞ, যাদের কাছে কোন ইলহামী গ্রন্থও ছিল না আর ইলহাম সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন মাধ্যমও যাদের নেই; চোখ ও হৃদয় থাকা সত্ত্বেও ঐশী তত্ত্বজ্ঞান তাদের আদৌ অর্জিত হয় নি, বরং ধীরে ধীরে মানবতার গন্ডি থেকেই বেরিয়ে গিয়ে তারা প্রায় কান্ডজ্ঞানহীন পশুর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। প্রকৃতিরূপী গ্রন্থ তাদের কোন উপকার করতে পারে নি। এটি স্পষ্ট যে, সে গ্রন্থ যদি উন্মুক্ত হতো, তাহলে তা কাজে লাগিয়ে আদিম-অসভ্য মানুষও তত্ত্বজ্ঞান এবং খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে তাদের সমান হয়ে যেতো, যারা ইলহামের মাধ্যমে খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে।

কেবল প্রকৃতিরূপী এই গ্রন্থের ওপরই যে নির্ভর করে আর কোন সময় ইলহামের নামও শোনে নি, খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ বরং মানবিক সভ্যতা-

ভব্যতা থেকে দূরে ও বঞ্চিতই থাকল। সুতরাং প্রকৃতিরূপী গ্রন্থ যে বন্ধ এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

অতএব, প্রকৃতিরূপী গ্রন্থ খোলা বা উন্মুক্ত হওয়ার অর্থ যদি এটি হয়ে থাকে যে, তা দৈহিকভাবে বা বাহ্যতও দৃশ্যমান; তাহলে এটি অর্থহীন বা অলীক এক ধারণা আর এ বিতর্কের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, যেখানে কোন ব্যক্তি কেবল এই প্রকৃতিরূপী গ্রন্থে প্রণিধান করে ধর্মীয় জ্ঞানের কোন কল্যাণ লাভ করতে পারে না, ইলহাম যতক্ষণ পথ প্রদর্শন না করবে, ততক্ষণ খোদাকে পেতে পারে না; সেখানে কোন বস্তু সর্বদা দৃশ্যমান কি না, তা ভেবে আমাদের কী লাভ!

ঐশী ইলহামের দ্বার কোন যুগে বন্ধ ছিল বলে যে ধারণা রয়েছে, এর দ্বারা যদি কিছু প্রমাণ হয় তবে তা কেবল এতটুকুই যে, পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে ব্রাহ্ম সমাজীদের কিছুই জানা নেই আর তাদের অবস্থা কেবল সেই অন্ধের ন্যায় যে রাস্তা ছেড়ে কোন গর্তে পড়ে গেছে, অথচ এই বলে হৈ চৈও করে যে, কোন্ দুরাচারী রাস্তায় গর্ত খুঁড়ে রেখেছে? অধিকন্তু এমন বিদ্বেষভাবাপন্ন ধ্যানধারণার মাধ্যমে এটি বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মসমাজীরা জেনেশুনে সত্য গোপন করছে আর জেনেশুনে একটি দৃশ্যমান ও বর্তমান বিষয়কে অস্বীকার করছে। নতুবা কীকরে ভাবা যেতে পারে যে, তারা এক ছোট বালকের ন্যায় এতটা অজ্ঞ যে, আজ পর্যন্ত এই প্রকাশ্য সত্য সম্পর্কে কিছুই জানে না যে, সকল যুগে খোদার একত্ববাদ তাঁর ইলহামের মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করেছে। অধিকন্তু, ঐশীতত্ত্ব সন্ধানীদের জন্য আদি থেকে এ পথই উন্মুক্ত হিসেবে চলে আসছে।

হে ভদ্র মহোদয়গণ! কিছুটা হলেও খোদাকে ভয় করুন, মিথ্যায় এতটা সীমা ছাড়িয়ে যাবেন না। মানলাম, আপনাদের হৃদয়চক্ষু ব্যাধিগ্রস্ত! তবু প্রশ্ন হলো, আপনাদের বাহ্যিক চোখ গেল কোথায়? আপনারা কি দেখেন না যে, কোটি কোটি একত্ববাদী অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী যাদের হৃদয় একত্ববাদের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা থেকে পরিতৃপ্তির সাথে পান করছে আর যাদের খাঁটি একত্ববাদের মোকাবিলায় আপনাদের বিশ্বাসের মাঝে বেশ কয়েকভাবে পৌত্তলিকতার দূষণ এবং শত প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি বিদ্যমান। তারা সেসব মানুষ, যারা ঐশীবাণী বা গ্রন্থ থেকে কল্যাণরাজি লাভ করেছেন, খোদার বাণীর সেই প্রস্রবণই প্রবল বেগে প্রস্ফুটিত হয়ে দূরদূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছে। এটিই ভারতের শুষ্ক প্রাণহীন উদ্যানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে সজীব-সতেজ করে তুলেছে আর যারা অবশিষ্ট আছে, তাদের মাঝেও অনেকের হৃদয়ে এই পবিত্র প্রস্রবণের প্রভাব পড়েছে এবং কিছুটা হলেও তাদেরকে একত্ববাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

কুরআনের শুভাগমনের পূর্বে হিন্দুদের ভ্রষ্টতা যে ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, তা সেসকল পুরাণ ও গ্রন্থাবলী পড়ে উদঘাটন করা উচিত, যা লিপিবদ্ধ করার কাজ শেষ হয়েছিল কুরআন আসার মাত্র কিছুদিন পূর্বে, আর যার পৌত্তলিকতায় কলুষিত শিক্ষা পুরো ভারতবর্ষকে একটি বৃত্তের ন্যায় পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। (এসব পাঠ কর) যেন তোমরা জানতে পার যে, সে যুগে তোমাদের পুণ্যবান মুনি-ঋষিদের ধ্যান-ধারণা কেমন ছিল আর তোমাদের প্রিয় মুনি-ঋষিরা কোন্ কোন্ কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল আর কীভাবে তারা নিষ্প্রাণ প্রতিমার সামনে করজোড়ে বিভিন্ন প্রকার মিনতি করতো আর কীভাবে বিভিন্ন মন্ত্র পড়ে দেবতাদেরকে আহ্বান করতো। অথচ সেযুগে তারা যৌক্তিক জ্ঞানের একটি ব্যাপক অংশ করায়ত্ত করেছিল আর প্রণিধান এবং মননশীলতার ক্ষেত্রে বেদের যুগের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল বরং যুক্তি ও দর্শনের ক্ষেত্রে গ্রীকদের চেয়ে কোনভাবে পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু, 'বিশ্বাস' এমনভাবে কলুষিত ও অপবিত্র ছিল যে, ভেতরে-বাইরে সম্পূর্ণভাবে শির্কের নোংরামিতে ছিল জর্জরিত, যাতে ঐশী সত্যের লেশমাত্রও ছিল না। আপাদমস্তক তা ছিল মিথ্যা, ভিত্তিহীন, অকেজো ও পরিত্যাজ্য, যে ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সারা বিশ্বকে আপনাদের সম্মানিত প্রবীণরা নিজেদের উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করে রেখেছিল! দৃষ্টান্তস্বরূপ, সতেজ-সবুজ-সুন্দর কোন বৃক্ষ দেখলে একে উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করেছে, ভূমি থেকে আগুনের কোন স্ফুলিঙ্গ বের হতে দেখলে তারই ইবাদত করা আরম্ভ করে দিয়েছে। যে বস্তুকে এর নিজ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কারণে বিস্ময়কর বা ভীতিকর মনে করেছে, তাকেই নিজের পরমেশ্বর হিসেবে গ্রহণ করেছে; আগুন, পানি, পাথর, চন্দ্রসূর্য ও পশুপাখী, কিছুই বাদ রাখেনি। সত্য কথা হলো, বেদে সৃষ্টি-পূজার শিক্ষা তখনও কিছুটা কমই ছিল আর প্রতিমা-পূজার কোন উল্লেখই ছিল না।

কিন্তু পরবর্তীতে যারা বড় বড় যুক্তিবাদী সেজে এতে ক্রমাগতভাবে টীকা-পাদটীকা যোগ করতে থাকে, তারা শত শত কৃত্রিম পরমেশ্বর বানানোর বা নিজেরাই পরমেশ্বর সেজে বসার ক্ষেত্রে এমনই পারদর্শীতা দেখিয়েছে যে, তাদের চিন্তাধারা ও ধ্যানধারণার চূড়ান্ত পরিণাম দেখুন! বিভিন্ন প্রকার উম্মাদনামূলক সন্দেহে জড়িয়ে তারা বিশ্ব পরিকল্পনাকারী খোদার প্রকৃতসত্তা ও তাঁর সব পরমোৎকর্ষ গুণাবলীকে অস্বীকার করে বসেছে।

তাদের উপনিষদ, পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী হিন্দুদের হৃদয়ে যে প্রভাব বিস্তার করেছে আর যেসকল কুসংস্কারে তাদেরকে লিপ্ত করেছে, আর যেসকল পথে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আর যে বস্তুনিচয়ের পূজায় তাদেরকে মত্ত করেছে, তা এমন বিষয় নয় যা কারও অজানা থাকবে বা কেউ গোপন করলে গোপন থাকতে পারে বা কারও অস্বীকারে তা সন্দেহযুক্ত হতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রীকদের অবস্থাও একই ছিল। তারাও বিচক্ষণ আখ্যা পেয়ে কাকের মত শির্ক বা বহুঈশ্বর পূজার আবর্জনাই ভক্ষণ করেছে। নিছক বুদ্ধি কোন যুগেই খাঁটি একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন জামাত গঠন করে নি।

আমি খুব ভালোভাবে গবেষণা করে দেখেছি যে, ব্রাহ্মসমাজীদের একত্ববাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হলো, তাদের প্রবীণদের মধ্য থেকে যে এধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিল, সে কুরআন থেকেই কিছুটা তৌহীদের ভাগ পেয়েছিলো, কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশত পুরো তৌহীদ লাভ করতে পারেনি। খোদার বাণী থেকে নেয়া সেই একত্ববাদ ব্রাহ্মসমাজীদের মাঝে বিস্তার লাভ করতে থাকে। ব্রাহ্মদের কারও যদি আমাদের এই গবেষণা সম্পর্কে আপত্তি থাকে, তাহলে তার জন্য আমাদের এ প্রশ্নের প্রমাণসাপেক্ষ উত্তর প্রদান করা আবশ্যক হবে যে, তৌহীদ বা একত্ববাদের বিষয়টি তারা কোথায় পেল? এটি কি পরম্পরাগতভাবে শ্রুতিনির্ভর বিষয় হিসেবে এসেছে, নাকি তাদের কোন প্রতিষ্ঠাতা নিরেট বুদ্ধির জোরে আবিস্কার করেছে?

যদি শ্রুতিমাধ্যমে পৌঁছে, তাহলে স্পষ্টভাবে বলা উচিত যে, পবিত্র কুরআন শরীফ ছাড়া অন্য কোন্ গ্রন্থ সেযুগে ভারতের সর্বত্র একথা প্রচার করেছিল যে, খোদা এক-অদ্বিতীয়, পরিবারপরিজন ও সন্তানসন্ততির উর্ধ্বে এবং কোন দেহে অবরোহন করা ও কোন রূপ ধারণ করা হতে পবিত্র, স্বীয় সত্তা ও সকল গুণাবলীতে সর্বোৎকৃষ্ট ও অনন্য– যার কল্যাণে একত্ববাদের বিষয়টি তারা শিখেছে; সে গ্রন্থের নামও তাদের উল্লেখ করা উচিত। আর যদি এ দাবী থাকে যে, সেই প্রতিষ্ঠাতার কাছে একত্ববাদের সংবাদ শ্রুতিনির্ভর মাধ্যমে পৌঁছেনি, বরং সে কেবল নিজের বুদ্ধির জোরে তা আবিস্কার করেছে, এমন ক্ষেত্রে তাকে প্রমাণ করে দেখানো উচিত যে, উল্লিখিত প্রতিষ্ঠাতার যুগে, অর্থাৎ যেযুগে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা একটি ধর্ম প্রবর্তন করতে যাচ্ছিলেন, তখনও ভারতে কুরআনের মাধ্যমে তৌহীদ বা একত্ববাদের বিস্তার ঘটেনি। কেননা, যদি পূর্বে বিস্তার ঘটে থাকে, তাহলে তৌহীদ বা একত্ববাদ খুঁজে বের করা কোন আবিষ্কার বলে গণ্য হবে না। বরং নিশ্চিতভাবে এটিই মনে করা হবে যে, এই ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্র কুরআন থেকেই তৌহীদের বিষয়টি হস্তগত করেছেন।

যাহোক, আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত জোরালো যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন না করবেন, ততক্ষণ এটিই প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে গণ্য হবে যে, আপনারা কুরআন শরীফ হতেই আল্লাহ্‌র তৌহীদ বা একত্ববাদের বিষয়টি অবগত হয়েছেন, কিন্তু নিমকহারাম মানুষের ন্যায় অকৃতজ্ঞই রয়ে গেলেন। স্বীয় অনুগ্রহকারী ও তত্ত্বাবধায়কের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি, বরং যাদের প্রকৃতিতে নোংরামি ও উশৃঙ্খলতা বিদ্যমান, তাদের ন্যায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে অপলাপের পন্থা বেছে নিয়েছেন। এছাড়া সকল ইতিহাসবিদ ভালোভাবে জানেন, অতীতেও যখনই কেউ খোদার নাম ও তাঁর অনুপম গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছে, তা ইলহামের মাধ্যমেই করেছে, কেবল যুক্তি ও বুদ্ধির জোরে তৌহীদ বা একত্ববাদের প্রসার কখনও ঘটেনি। সে কারণেই যেখানে ইলহাম পৌঁছেনি, সেখানকার মানুষ খোদা সম্পর্কে অনবহিত এবং পশুর ন্যায় বাছবিচারহীন তথা আদিম ও বর্বরই রয়ে গেছে।

আমাদের সামনে এমন কোন গ্রন্থ কেউ উপস্থাপন করতে পারবে কি, যা অতীতের কোন যুগে খোদার জ্ঞানের বিবরণমূলে ও বাস্তব সত্যভিত্তিক তথ্যাদিতে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে, যাতে লেখক এই দাবী করে থাকবে যে, সে খোদাকে চেনার সঠিক পথ ইলহামের মাধ্যমে অর্জন করেনি, এক-অদ্বিতীয় খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে শ্রুতিনির্ভর পদ্ধতিতেও সংবাদ পায় নি, বরং খোদাকে খুঁজে বের করা ও ঐশী গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে কেবল নিজের বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা, চেষ্টাসাধনা এবং ঘর্মপাতের মাধ্যমেই কার্যসিদ্ধি করেছে; অন্য কারও শিক্ষা ছাড়া নিজেই একত্ববাদের বিষয়টি উদঘাটন করেছে আর মানবমস্তিষ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোদা সম্পর্কে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভে সক্ষম হয়েছে এবং খোদাকে পূরোপুরি চিনতে পেরেছে! প্রমাণের ভিত্তিতে কে আমাদেরকে দেখাতে পারে যে, এমন কোন যুগও ছিল– যখন পৃথিবীতে খোদার ইলহামের নাম গন্ধও ছিল না আর খোদার পবিত্র গ্রন্থাবলীর দ্বার রুদ্ধ ছিল, অধিকন্তু সে যুগের মানুষ কেবল প্রকৃতিরূপী গ্রন্থের সাহায্যে একত্ববাদ ও আল্লাহ্‌কে চেনার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে?

এমন কোন দেশের সংবাদ আমাদেরকে কেউ দিতে পারে কি, যে দেশের বাসিন্দারা ইলহাম সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অনবহিত থেকেও শুধু বুদ্ধির জোরে খোদা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আর কেবল স্বীয় বোধ-বুদ্ধির বলে স্রষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে? অজ্ঞদেরকে আপনারা প্রতারিত করেন কেন? কেন আপনারা খোদাভীতিকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে প্রহসন ও প্রতারণামূলক কথা মুখে আনেন আর যা অবারিত তাকে বন্ধ আর যা বন্ধ তাকে অবারিত আখ্যা দেন? প্রশ্ন হলো, আপনাদের সেই সর্বশক্তিমান সত্তায় বিশ্বাস আছে কি না, যিনি মানবহৃদয়ের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে অবহিত আর বিশ্বাসঘাতক শ্রেণী যার সুগভীর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না?

কিন্তু, সমস্যা হলো আপনাদের ঈমানই হলো সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গার ন্যায়, যেখানে স্বচ্ছ ও নির্মল আলোর নাম গন্ধও নেই। সে কারণেই, আপনাদের ধর্মও সহস্র সহস্র প্রকার সংকীর্ণতা ও অমানিশার সমাহার আর এমনতর সংকুচিত ও সংকীর্ণ যে, এর কোন অংশই অবারিত দেখায় না। এর কোন জটিল গ্রন্থি যথাযথ ও পরিষ্কারভাবে খুলেছে বলে মনে হয় না। আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে আপনাদের বিশ্বাস কেমন ও কতটা, তা ইতোমধ্যে আপনাদের শ্রুতিগোচর হয়েছে। বাকী থাকলো, শাস্তি-পুরস্কার সম্পর্কে আপনাদের বিশ্বাসের স্বরূপ এবং প্রকৃতির আইন আপনাদের সামনে এ সম্পর্কে কোন্ কোন্ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করেছে। অতএব, এক্ষেত্রেও হীন ধ্যানধারণা ও উম্মাদনাপ্রসূত অলীক সন্দেহ ছাড়া অন্য কিছুই আপনাদের হাতে নেই, শাস্তি-পুরস্কারের আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি জানা তো দূরের কথা। প্রধানত এ কথাই আপনাদের নিশ্চিৎভাবে জানা নেই যে, শাস্তি-পুরস্কার সত্যিই এক অবশ্যম্ভাবী বিষয় আর খোদা অবশ্যই মানুষকে তাদের কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন।

যদি আপনাদের তা জানা থাকে, তাহলে যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করে দেখান যে, খোদার জন্য আদম সন্তানদেরকে তাদের পরহেযগারী বা সাধুতার প্রতিদান দেয়া এবং পাপীদের দুষ্কর্ম ও পাপাচারিতার

শাস্তি দেয়া কেন আবশ্যক? খোদার জন্য যেখানে সমগ্র পশুকূলের আত্মার মোকাবেলায় তথা সব জীবের আত্মাকে নিশ্চিহ্ন করে মানবাত্মাকে স্থায়ীত্ব দেয়া আবশ্যক নয়, সেখানে বিশেষ মানুষকে শাস্তি-পুরস্কার প্রদান আর অন্যদেরকে তা হতে বঞ্চিত রাখা তাঁর জন্য কেন আবশ্যক হবে? তোমাদের পুণ্যে খোদার কোন লাভ হয় কি? আর তোমাদের পাপে তাঁর কোন কষ্ট হয় কি– যে কারণে তিনি পুণ্যে প্রশান্তি পেয়ে তাদেরকে প্রতিদান দেবেন আর পাপীদের হাতে কষ্ট পেয়ে তাদের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হবেন? আর যদি তোমাদের পাপ ও পুণ্যে তাঁর ব্যক্তিগত কোন লাভ-লোকসান না হয়, সেক্ষেত্রে তোমাদের আনুগত্য করা ও না করা তাঁর জন্য সমান। যদি সমানই হয়ে থাকে তাহলে এমন পরিস্থিতিতে অনর্থক কর্মফল হিসেবে শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের বিধান কী করে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে পারে? এটি কি ন্যায়সঙ্গত হবে যে, অন্যের নির্দেশ ছাড়াই কেউ সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছায় কোন কাজ করবে, তবুও অন্যের ওপর অনর্থক তার কোন অধিকার বর্তাবে? এটি কখনও হতে পারে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মধুর নির্দেশ ছাড়াই যদু কোন গর্ত খোঁড়ে বা কোন অট্টালিকা নির্মাণ করে আর যদি আমরা যুক্তির খাতিরে একথা মেনেও নিই যে, এতে মধুর প্রভূত কল্যাণ নিহিত, তবুও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে মধুর জন্য যদুকে পারিশ্রমিক প্রদান আবশ্যক নয়; কেননা যদুর সেই পরিশ্রম ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, মধুর অনুরোধ বা নির্দেশে নয়। তাই, যেখানে আমাদের পুণ্যে খোদার কোন লাভ হয় না, বরং সমগ্র বিশ্বও যদি পরহেজগার এবং পুণ্যবান হয়ে যায় তবুও খোদার রাজত্বে এতটুকুও সংযোজিত হতে পারে না; পক্ষান্তরে তাদের সবাই যদি অপকর্মকারী ও পাপাচারী হয়ে যায়, তবুও তাঁর রাজত্বে অণুপরিমাণ বিপত্তি দেখা দিতে পারে না; এমন পরিস্থিতিতে যদি খোদার পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি না থাকে, তাহলে নিশ্চিত করে কীভাবে বোঝা যাবে যে, তিনি আমাদের পাপ ও পুণ্যের অবশ্যই প্রতিদান দেবেন? অবশ্য খোদার পক্ষ থেকে যদি কোন প্রতিশ্রুতি থাকে, তাহলে সুস্থ চিন্তাধারার সকল মানুষ নিশ্চিতভাবে জানে যে, তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করবেন। নির্বোধ না হয়ে থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তি খুব ভালোভাবে জানবে যে, প্রতিশ্রুতি দেয়া ও না দেয়া কোনভাবেই সমান হতে পারে না।

প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে যে প্রবোধ ও প্রশান্তি লাভ হয়, তা স্বপ্রস্তাবিত অলীক ধারণার মাধ্যমে লাভ হওয়া সম্ভব নয়। যেমন– পবিত্র কুরআনে খোদা তা'লা বিশ্বাসীদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

(সূরা আন্ নিসা:১২২) অর্থাৎ খোদা পুণ্যবান মু'মিনদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, খোদার পক্ষ থেকে এটি সত্য প্রতিশ্রুতি আর কথায় খোদার চেয়ে বেশি সত্যবাদী আর কে হতে পারে?

ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এখন নিজেই বল, নিছক ধারণা এই সত্য প্রতিশ্রুতির সমান হতে পারে কি? এ দু'টি পরিস্থিতি কখনও একরকম হতে পারে কি? একজনকে কোন পুণ্যবান ব্যক্তি স্বয়ং কিছু সম্পদ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন আর অপরজনকে সেই সরলপ্রাণ ব্যক্তি কোন প্রতিশ্রুতি দেন না; তাহলে প্রশ্ন হলো, সুসংবাদ প্রাপ্ত এবং যে সুসংবাদ পায় না, তাদের উভয়ে সমান হতে পারে কি? এখন নিজেই চিন্তা কর, বেশি স্বচ্ছ, পরিস্কার ও প্রশান্তিকর কাজ কি সে'টি, যাতে খোদার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি থাকে, নাকি সেটি, যা নিছক নিজেরই পরিকল্পনার ফসল; পক্ষান্তরে খোদার পক্ষ থেকে বিরাজ করে নীরবতা? এমন বুদ্ধিমান কে হবে, যে প্রতিশ্রুতিকে প্রতিশ্রুতিশূন্যতা থেকে উত্তম মনে করে না? এমন হৃদয়ও আছে কী, যা প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য ছটফট করে না? খোদার পক্ষ থেকে যদি সর্বদা নীরবতাই বিরাজ করে, তাহলে কিসের ভরসায় কেউ পরিশ্রম করবে? সে কি নিজের কল্পনারাজিকে খোদার প্রতিশ্রুতি আখ্যায়িত করতে পারে? মোটেই নয়? যার ইচ্ছা সম্পর্কে জানা নেই যে তিনি কখন আর কীভাবে কী প্রতিদান দেবেন, নিজ থেকে কে তার কাজে দৃঢ়আশা ও বিশ্বাস পোষণ করতে পারে? আর নৈরাশ্যকর পরিস্থিতিতে কি করে কেউ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে?

খোদার প্রতিশ্রুতিই মানুষের প্রচেষ্টাকে বেগবান করে আর মানুষের হৃদয়ে পূর্ণ উদ্যম সঞ্চার করে থাকে। সেসবের আশায় বুক বেঁধে বিবেকবান মানুষ এ পৃথিবীর মোহ পরিত্যাগ করে আর কেবল খোদার খাতিরেই সহস্র সহস্র সম্পর্ক-বন্ধন ও শৃঙ্খলের সাথে যোগসূত্র ছিন্ন করে। সে সকল প্রতিশ্রুতিই, যা লোভ-লালসায় নিমজ্জিত কোন মানুষকে চিরতরে খোদার পানে টেনে আনে আর যে মুহূর্তে এক ব্যক্তির সামনে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খোদার কথা সত্য আর তাঁর সকল প্রতিশ্রুতি একদিন অবশ্যই পূর্ণ হতে যাচ্ছে, তখনই জগতের প্রতি তার মোহ শিথিল হয়ে যায়। হঠাৎ করে সে ভিন্ন মানুষে পরিণত হয় আর ভিন্ন কোন স্থানে সে পৌঁছে যায়। সারকথা হলো, ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে হোক বা কর্মের নিরিখেই হোক বা পুরস্কারের আশায় হোক অথবা শাস্তির ভয়েই হোক না কেন, সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই একমাত্র উন্মুক্ত ও অবারিত দ্বার হলো খোদার সত্য-ইলহাম ও পবিত্র বাণীর দ্বার, অন্য কিছু নয়।

সেই অনন্য সত্তার পবিত্র কালাম বা বাণী তত্ত্বজ্ঞানের শত পেয়ালা উপহার দেয়

যে এই সূরার স্বাদ কখনও গ্রহণ করে নি সে কিভাবে ঈমানের স্বাদ পেতে পারে?

সেই চোখ চোখ নয় যা সারাটি জীবন অন্ধত্বের মাঝে অতিবাহিত করেছে

সেই কান কান নয়, যা কখনও প্রেমাস্পদের কথা শুনতে পায় নি।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

এযালায়ে আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৪৪তম কিস্তি)

(৫) প্রশ্নঃ 'ইবনে মরিয়ম'-এর অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত যে বর্ণনা হাদীসাবলীতে রয়েছে, এ প্রসঙ্গে 'সাল্‌ফ' ও 'খাল্‌ফ' তথা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যকার কেউ এ ব্যাখ্যা করেন নি যে, 'ইবনে মরিয়ম' শব্দটি দ্বারা আক্ষরিক ও বাহ্যিকভাবে যে স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-কে বুঝায় তা সঠিক নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি দ্বারা তাঁর কোনো সদৃশ ও প্রতিচ্ছবিকে বুঝায় (যিনি এই উম্মতে আখেরী যুগে আবির্ভূত হবেন)। তাছাড়া, এ বিষয়ে 'ইজমা' (সর্বসম্মত অভিমত) রয়েছে যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাসমূহকে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। শক্তিশালী প্রমাণ ও অত্যাবশ্যক কারণ ছাড়া এগুলোকে 'বাতিন' তথা রূপক অর্থের দিকে ঘোরানো যাবে না।

উত্তরঃ অতএব জানা আবশ্যক, 'সাল্‌ফ' ও 'খাল্‌ফ' তথা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য হাদীসাবলীতে ইবনে মরিয়মের অবতরণ সংবলিত বর্ণনাটি এমর্মে এক ঈমান সংক্রান্ত বিষয় ছিল যে, তারা সবাই উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটিতে 'ইজমালী' তথা মোটামুটি ও সামগ্রিক ভাবে বিশ্বাস রাখবে। তাঁরা কখনও এ দাবী করেন নি যে, তাঁরা এ ভবিষ্যদ্বাণীর গভীরে এর গোড়া বা তলদেশ পর্যন্ত উপনীত হয়েছেন এবং প্রকৃতপক্ষে 'ইবনে মরিয়ম' দ্বারা নিশ্চিৎভাবে ঈসা (আ.)-কেই বুঝায়। তাঁদের পক্ষ থেকে যদি এরকম দাবীই হতো, তাহলে তাঁরা (সাহাবা-কিরাম) দাজ্জালের মৃত্যুতে বিশ্বাস করতেন না এবং কুরআন করীমের যেসব জায়গায় হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোকেও তারা আলোচনায় বা আমলে নেয়ার বহির্ভূত বিষয় মনে করে নীরব-ভূমিকা অবলম্বন করতেন না। আর অনুমানস্বরূপ যদি এও মেনে নেয়া হয় যে, সাহাবা কিরামের মাঝে কেউ এমনটিই ভেবেছিলেন যে, 'ইবনে মরিয়ম' বলতে হযরত ঈসাকেই বুঝায়, তাতেও কোনো যায়-আসে না। কেননা, ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মূলতত্ত্ব ও প্রকৃতস্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে সেগুলো বাস্তবে পুরো হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো কোনো সময় নবীগণেরও ভ্রম বা ভুল হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে কোনো সাহাবীর যদি ভুল হয়ে যায়, তাতে বিস্ময়েরই বা কী আছে? আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি-ক্ষমতা সমগ্র উম্মতের অন্তর্দৃষ্টির চেয়েও নিঃসন্দেহে বেশি, বরং আমাদের ভাই (উলামা) যদি ত্বরিৎ উত্তেজিত না হয়ে ওঠেন, তাহলে আমার ধর্ম ও দৃঢ়-বিশ্বাস তো এটাই যে, সকল নবীর অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধিক্ষমতা কখনও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধিক্ষমতার সমান নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে স্বীকার করেছেন যে সেগুলোর প্রকৃত অর্থ বা আসল স্বরূপ বুঝতে তাঁর ভুল বা ভ্রম হয়েছে। ইতোপূর্বেও কয়েকবার আমি লিখে এসেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রীদের মাঝে প্রথমে তিনি (পরকালে) আমার সাথে মিলিত হবেন, যাঁর হাত অন্য সবার চে' লম্বা হবে।' সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনেই তখন পুণ্যবতী সহধর্মিণীগণ পরস্পরের হাত মাপতে শুরু করেন। যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণীটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেও অবহিত ছিলেন না, সেহেতু নিষেধ করেন নি যে তাঁদের এ ধারণাটি ভুল। অবশেষে তাঁদের ভুল ধরালো ভবিষ্যদ্বাণীর পুরো হওয়ার সময়টি। সময়কাল যদি এ উম্মুল মুমীননদেরকে অবকাশ দিতো এবং তাঁরা সবাই আমাদের এযুগ পর্যন্ত জীবিত থাকতেন, তাহলে এটা স্পষ্ট যে, সাহাবার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সারা উম্মত এ কথায় একমত হতো যে, সবচেয়ে লম্বা হাত যাঁর, তিনিই সবার আগে মারা যাবেন। এরপর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পুরো হওয়ার সময়ে অন্যদের তুলনায় কম লম্বা হাত যার, তিনি মারা গেলে সেই 'ইজমা' তথা ঐকমত্যটির দরুন কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পোহাতে হতো। আর এর

ফলশ্রুতিতে তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কতোটা মানহানির কারণ হতেন এবং নিজেদের ঈমানকে তারা সন্দেহের আবর্তে ফেলে দিতেন।

এ মুহূর্তে আমার এক বন্ধুর কথা আমার স্মরণ হচ্ছে। খোদা তা'লা তাঁকে নিজ রহমতের বারিধারায় সিক্ত করুন। প্রয়াত এ বন্ধুর নাম ছিল হাফেয হেদায়াত আলী। তিনি এক সময় গুরুদাসপুর জেলার এক্সট্রা এসিসটেন্ট (সহকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) ছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল বাটালা পরগণার 'তহসীলদার' (এস.ডি.ও) ছিলেন। এক সভায় তিনি বলেন, 'আখেরী যুগে যে কতগুলো বিষয় প্রকাশিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং (উলামা কর্তৃক) এগুলোর যেসব অর্থ করা হয়েছে, এগুলোর সম্পর্কে আমাদের এরকম আকিদা-বিশ্বাস রাখা উচিত নয় যে, এগুলো অবশ্য অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে ও বাহ্যিক আকারেই পুরো হবে। কারণ এগুলোর প্রকৃত স্বরূপ ও মূলতত্ত্ব যদি অন্য ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহলে আমরা যাতে এর দরুণ হোঁচট না খাই ও পদস্খলিত না হই এবং যাতে আমাদের ঈমান সালামত ও নিরাপদ থাকে।' তিনি আরও বলেন, 'যথাসম্ভব আমরা যেহেতু প্রতিশ্রুত সে-যুগেই জন্মলাভ করেছি, যে-যুগটিকে আজ থেকে কিছু কম তেরো শ' বছর পূর্বে 'আখেরী যুগ' বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেহেতু এ যুগ সম্পর্কিত কিছু সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী যদি আমাদের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়, তাহলে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কাজেই মোটামুটি ভাবে ঈমান রাখার নীতি দৃঢ়ভাবে আমাদের অবলম্বন করা উচিত এবং কোনো অংশবিশেষের ওপর তেমন জোর দেয়া উচিত নয়, যেমনটি কেবল সে-অবস্থাতে দেওয়া যায় যখন কোন এক বাস্তবতার তলদেশ বা গোড়া পর্যন্ত আমরা উপনীত হই। 'তাম্মা কালামুহু' (অর্থৎ 'তাঁর বক্তব্য এখানে সমাপ্ত হলো– অনুবাদক)।

বস্তুতপক্ষে এটি সত্য এবং একেবারেই সত্য যে, ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়াদির সাথে 'উম্মতের ইজমা'র কোনো সম্বন্ধ ও সংস্রব নেই। আমাদের বর্তমান কালের মৌলবী-মৌলানাদের কঠিন এই ধোকা লেগেছে যে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের প্রকৃতস্বরূপ ও মূলতত্ত্ব এখনও অদৃশ্যের পর্দার আড়ালে থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যদ্বাণী সমূহকেও তাঁরা 'ইজমা'-এর জাঁতাকলে কসিয়ে আবদ্ধ করতে চান।

প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অন্তঃসত্তাধারিনী স্ত্রীলোকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, আমরা একজন গর্ভবতী নারী সম্পর্কে এটা তো বলতে পারি যে, কোনো শিশু অবশ্যই তার গার্ভে রয়েছে এবং নিশ্চয় সে শিশুটি নয় মাস দশদিনের মধ্যে জন্মলাভও করবে। কিন্তু এটা বলতে পারি না যে, তার অবয়ব কী? তার দৈহিক গঠন কেমন এবং তার মুখমণ্ডলের রূপ-নকশা কীরূপ? সেকি পুত্র সন্তান নাকি নিঃসন্দেহে কন্যা সন্তান? সম্ভবত এ স্থলে কারো মনে এ আপত্তি মাথা চাড়া দিতে পারে যে, ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের অবস্থা যখন এমনই, তখন এগুলো আস্থাযোগ্য নয় এবং কোনো নবীর প্রেরিতত্তের সত্যতার সপক্ষে দলিল ও সবাক সাক্ষ্যস্বরূপ বিবেচিত হবার বা কোনো অস্বীকারকারী বিরুদ্ধবাদীর সামনে উপস্থাপনের উপযুক্ত নয়। এর উত্তর হলো, ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কখনও এগুলোর আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থেই পুরো হয়, আবার কখনও এগুলোর অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ অভীষ্ট রূপক অর্থে পুরো হয়ে থাকে। এতে করে রাব্বানী (ঐশী) ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় ঘটে না, বরং সূক্ষ্মদর্শীদের দৃষ্টিতে অধিকতর মাহাত্ম্য প্রস্ফুট হয়। দার্শনিকদের কোনো কথা যদি মানুষ উল্টো অর্থে বুঝে থাকে, তারপর যদি এর অভীষ্ট যুক্তিসঙ্গত অর্থ বলিষ্ঠ প্রমাণাদিসহ প্রকাশিত হয় তাহলে এ ভুলের কারণে কি সেই প্রকৃত ও সঠিক অর্থের কোনো ক্ষতি সাধিত হতে পারে? না, কখনও তা হতে পারে না। তাছাড়া ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মাঝে অবশ্যই এমন এক অভিন্ন, সাধারণ ও স্বাভাবিক মূল্যবোধ বিদ্যমান থাকে যে, তা সেসব ভবিষ্যদ্বাণী বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে বিবেচিত হোক কিংবা অবশেষে এগুলার কোনো রূপক অর্থে পুরো হোক, উল্লিখিত সাধারণ এক ও অভিন্ন মূল্যবোধটি অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয় যে, এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃতপক্ষে সত্য এবং মানবীয় ক্ষমতার উর্ধে।

তাছাড়া যেসব ভবিষ্যদ্বাণী বিরুদ্ধবাদীর সামনে দাবীস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়, সেগুলোতে বিশেষ আলোক ও হেদায়াত (পথনির্দেশনা) নিহিত থাকে এবং মুলহাম তথা ঐশীবাণী-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র দরবারে প্রণত হয়ে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করণের মাধ্যমে সেগুলোর অধিকতর স্বচ্ছতামূলক উন্মোচন সাধন করিয়ে থাকেন। কিন্তু সাধারণত এগুলোর ভিতরে অনেক কিছু বিষয় লুক্কায়িত থাকে এবং (তা সত্ত্বেও) খামাখা এমনটি মনে করা যে, ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অবশ্যই বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থেই হয়ে থাকে বলে ধারণা করা অজ্ঞতা সুলভ জেদ ও অযথা হটকারিতা বৈ কিছু নয়। ইহুদী ও খ্রিষ্টনদের বইপুস্তকে দৃষ্টিপাতকারী ব্যক্তি মাত্রই ভালোভাবে জানেন যে, ঐশী পুস্তকাদিতে লেখা ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে উপমামূলক ও রূপকাশ্রিত বিষয়াদি ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি, কতক জায়গায় দিবস উল্লেখ করে এদ্বারা বছর বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কাশফ বা দিব্যদর্শন-শ্রেণীভুক্ত এবং সেই উৎস থেকে প্রস্ফূটিত, যা উপমামূলক ও রূপক ভাষায় রঙীন। নিজেদের স্বপ্নগুলোতে লক্ষ্য করুন, স্বপ্নে কোনো কিছুও কি সোজা-সিধাভাবে পরিদৃষ্ট হয়? হলেও তা অতি বিরলভাবে হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, খোদা তা'লা কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শন ও সত্যস্বপ্নগুলোও উপমা ও রূপকতার তত্ত্বপূর্ণ স্বর্গীয় পোষাকে সজ্জিত করে তাঁর নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত করে থাকেন। অতএব, এ সত্যটি গ্রহণ ও বরণ করাকে 'ইল্‌হাদ' বলে অভিহিত করাটাই বরং, স্বয়ং ইল্‌হাদ। কেননা একটি অর্থকে এর আসল ও মূল থেকে ভিন্নদিকে ঘোরানোকেই ইল্‌হাদ বলা হয়।

অতএব, খোদা তা'লার প্রাকৃতিক নিয়ম যখন 'কাশফ' বা দ্বিব্যদর্শন এবং সত্য স্বপ্নের জন্য অধিক ক্ষেত্রে রূপকতাপূর্ণ হওয়াকেই মূলনীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছে, তখন এই মূলনীতি থেকে অন্যদিকে ঘোরানো এবং দাবী করা যে, ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ আবশ্যকীয় ভাবে সর্বদা আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থেই গৃহীত হবে– এটা 'ইলহাদ' নয় তো কী?!

নামায ও রোযার মতো ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকেও আক্ষরিক ও বাহ্যিকভাবে সুপ্রকাশিত বিষয় বলে মনে করা ও দাবী করা বড় ধরণের এক ভুল ও মারাত্মক ধোকা বৈ কিছুই নয়। এ সকল আহকাম বা নির্দেশসমূহ তো স্বয়ং মহানবী (সা.) কার্যত পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এবং এগুলোকে সম্পূর্ণ আবরণমুক্ত আকারে রেখে গেছেন। কিন্তু

ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কেও কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একথাই বলেছেন যে, এগুলো সর্বতোভাবে আবরণমুক্ত এবং এগুলোতে এমন কোনো প্রকৃত তত্ত্ব লুক্কায়িত নয়, যা বাস্তবায়নকালে সঠিক অর্থে বুঝা যায়? এ মর্মে কোন সহীহ্ হাদীস মওজুদ থাকলে তা কেন উপস্থাপন করা হয় না? আপনারা অবশ্যই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার অধিকারী নন। সহীহ্ বুখারী বর্ণিত এ হাদীসটি দেখুন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে (স্বপ্নে) যখন একটি রেশমী বস্ত্রখন্ডে আবৃত হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা.) ছবি দেখিয়ে বুঝানো হয় যে, ইনি তাঁর (সা.) স্ত্রী হবেন, তখন তিনি (সা.) কখনও এ দাবী করেন নি যে, এ (স্বপ্নে দেখানো) আয়েশা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়েশাকেই (রা.) বুঝায়।' বরং মহানবী (সা.) বলেন, 'এ ছবি দ্বারা যদি প্রকৃতপক্ষে আয়েশাকেই বুঝায়, তাহলে তাঁকে অবশ্যই (বিবাহ বন্ধনে) দান করা হবে। নচেৎ সম্ভবত আয়েশা দ্বারা অন্য কোনো স্ত্রীলোক বোঝায়।" (সহীহ্ বোখারী –অনুবাদক)।

তিনি (সা.) আরও বলেন, (স্বপ্নে) আমাকে আবু জাহ্‌লের জন্য বেহেশ্‌তের একগুচ্ছ আঙ্গুর দেয়া হয়। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণীটির প্রতীক ও প্রকাশস্থল হিসেবে সাব্যস্ত হন (আবু জাহলের পুত্র) ইক্‌রামা। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তা'লা বিশেষভাবে কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর সবদিক তাঁর (সা.) প্রতি সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত করেন নি, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এর অংশ বিশেষ সম্পর্কেও নির্দিষ্টভাবে কোনো দাবী করেন নি।

আপনারা জানেন, (হযরত) আবুবকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবুজাহ্‌লের সাথে শর্ত ধরলেন এবং **'গুলিবাতির রূম ফি আদনাল আরযি ওয়াহুম্ মিম্ বা'দি গালাবিহিম্ সাইয়াগলিবূন'–** কুরআন করীমের এ আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটি সে-শর্তের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করলেন। [আয়াতগুলোর অর্থঃ **আলিফ-লাম-মিম** অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি। রোমানদেরকে পরাজিত করা হয়েছে নিকটবর্তী দেশে আর তাদের পরাজয়ের পর তারা বিজয়ী হবে কয়েক (তথা তিন থেকে নয়) বছরের মাঝে' (আর-রূম ২-৫)] –অনুবাদক। আয়াতটিতে তিনি (রা.) ('বিয্‌আ' শব্দের অর্থ তিন বছর নির্ধারণ করায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণীটির বিবরণ লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ দূরদর্শীতা অবলম্বনে হযরত আবু বকরকে তাঁর উপস্থাপিত শর্তটির সংশোধন করতে আদেশ দেন। কেননা 'বিয্‌আ সিনিন' শব্দটি 'তিন বছরে' নির্দিষ্ট নয়, বরং প্রায়শ 'নয় বছর' পর্যন্ত এর প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়।

অনুরূপভাবে, উম্মতকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর কোনো কোনো ভবিষ্যদ্বাণী অনুধাবনে তাঁর নিজেরও (মানবসুলভ) ভ্রম সংঘটিত হওয়ার বিষয় ব্যক্ত করেন। কাজেই নবী করীম (সা.)-এর এ শিক্ষা কি যথেষ্ট নয়? আর এ শিক্ষা কি উচ্চৈঃস্বরে (এ নির্দেশটি) জানিয়ে দিচ্ছে না যে, ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের প্রতি সামগ্রিকভাবে ঈমান রাখা এবং এগুলোর বাস্তবায়নে এগুলোর মূলতত্ত্ব ও প্রকৃতস্বরূপ উন্মোচন খোদা তা'লার ওপর ন্যাস্ত করা কর্তব্য?

হে সম্মানিত উলামা! আপনারা একা একা নিজেদের গৃহে নিভৃতে বসে চিন্তা-ভাবনা করুন। নিজেদের বিছানায় শোয়া অবস্থায় সরলমনে সিধাসাদাভাবে আমার কথায় মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। নিজেদের মৃত্যুকে স্মরণ করে এক নিরপেক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টি অর্জন করুন এবং পরখ করে ভালভাবে দেখুন, তাক্‌ওয়ার পথ কোন্‌টি এবং সাবধানতা ও খোদাভীরুতার পথগুলো কী? আমার উপস্থাপিত বিষয় যদি আপনাদের দৃষ্টিতে সন্দেহযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে এতেও কি আপনাদের কোনো আপত্তি আছে যে, আপনারা মোটমুটিভাবে নিজেদের ঈমানে কায়েম থাকেন এবং উল্লিখিত বিষয়ে এর সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী সংবলিত বিস্তারিত বিবরণে খামাখা অনধিকার চর্চা না করে আমাকে আমার খোদা তা'লার সঙ্গে ছেড়ে দেন?

আমি কারও প্রতি জবরদস্তি করি না। এ কেবল একটি 'তবলীগ' (তথা জরুরী বার্তা পৌঁছানোর কর্তব্য পালন বিশেষ), চাইলে কেউ তা শুনুক বা না শুনুক। আল্লাহ্ তা'লা কাউকে যদি দৃঢ়বিশ্বাস দান করেন এবং সে আমাকে সনাক্ত করে আমার বার্তা গ্রহণ করে, তাহলে সেব্যক্তি বিশেষভাবে আমার ভাই। নিঃসন্দেহে সে তার ঈমানের জন্য পুরস্কৃত হবে। তবে আপনারা যদি এটুকুও করেন যে, উল্লেখিত এ ভবিষ্যদ্বাণীটির লুক্কায়িত সূক্ষ্ম বিষয়াবলী খোদা তা'লার ওপর সমর্পণ করেন এবং ঈমানের সীমানায় অবস্থান করেন এবং খামাখা পরিপূর্ণ 'ইরফান' তথা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তত্ত্বোপলব্ধির দাবী না করেন, তাহলে এতে আপনাদের কী-বা ক্ষতি রয়েছে? এবং খোদার দরবারে কী-বা জবাবদিহির আশঙ্কা? আপনারা যদি তদ্রুপ করেন, তাহলে এ কারণে কি আপনাদের জবাবদিহি হবে? কিন্তু আপনারা যদি ঈমানের সীমানা অতিক্রম করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সে-বিষয়ের দাবী করেন, যে সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞান দেয়া হয় নি, তাহলে নিঃসন্দেহে এই অনধিকার চর্চার জন্য (আল্লাহ্‌র দরবারে) আপনাদের জবাবদিহি হবে।

হে সম্মানভাজন মৌলবী সাহেবান! আপনারা কেন মানুষদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং কেন নিজেদের জ্ঞানের ঊর্ধে দাবি-দাবা করেন? ইবনে-মরিয়মের নযুল বা অবতরণ সম্পর্কিত হাদীসে যদি কোনো বিপক্ষীয় জোরালো কারণ তথা যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হতো, আর কেবল ইলহাম বা ঐশীবাণীর মাধ্যমে একজন মুসলমান এর অর্থ আপনাদের সামনে এমর্মে উন্মোচিত করতেন যে, (হাদীসে বর্ণিত) ইবনে মরিয়ম শব্দটি দ্বারা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-কে বুঝায় না, তাহলেও এর মোকাবেলায় আপনাদের এ দাবী করার অধিকার বর্তাতো না যে, ইবনে মরিয়ম শব্দটি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মরিয়মপুত্র হযরত ঈসাকেই বুঝায়। কেননা, কাশ্‌ফ সম্পর্কিত বিষয়াবলীতে 'ইস্তিআরা' তথা রূপকাশ্রিত বিষয়াদি প্রবল ও প্রচুর মাত্রায় রয়েছে এবং আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে ঘোরাণোর জন্য 'ইলহাম ইলাহী' বা ঐশীবাণী জোরালো প্রমাণ বা কারণের কাজ করতে পারে এবং আপনারা এতে সুধারণা ও সুবিশ্বাস পোষণের জন্য আদিষ্ট।

কিন্তু এ জায়গায় তো কেবল ইলহামই নয়, বরং অন্যান্য জোরালো কারণ এবং যুক্তি-প্রমাণও বিদ্যমান রয়েছে। এ কি কোনো কম জোরালো কারণ যে, মরিয়মপুত্র ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুবরণ সম্পর্কে খোদা তা'লা তো অনেকগুলো আয়াতে বিশদভাবে বর্ণনা করেন, কিন্তু তাঁর জীবিত থাকা এবং জীবিতাবস্থায় তাঁকে (আকাশে) ওঠানোর সম্পর্কে ইঙ্গিত-ইশারা পর্যন্ত করেন নি? একি

কোনো কম জোরালো প্রমাণ? হযরত নবী করীম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আগমনকারী এবং (পূর্ববর্তী) ইবনে-মরিয়মের একই রকম অবয়ব ও হুলিয়া বর্ণনা করেন না কি? বরং তিনি উভয়ের হুলিয়া ভিন্ন রকম বর্ণনা করেছেন। এটিও কি কোনো কম জোরালো প্রমাণ? আর এও কি কোনো কম জোরালো প্রমাণ যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আগমনকারীকে একজন উম্মতি বলে অভিহিত করেছেন এবং তাকে খানা-কা'বার তোয়াফ করতে দেখেছেন?!

আর এই ওজর যে, 'নুসূস' অর্থাৎ- কুরআন ও হাদীসের মূলভাষ্যসমূহ আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে বলে 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত– এ সম্পর্কে জানা আবশ্যক যে, এটি এমন এক ওজর, যার দরুন আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আমাদের হুজ্জত তথা অকাট্য যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা, পবিত্র কুরআনের প্রকাশ্য মূলভাষ্যসমূহে কোনো কারণ ও প্রমাণ ছাড়াই আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে তারা রূপক অর্থে গ্রহণ করার (স্বঘোষিত) 'অবৈধ পদ্ধতি' নিজেরা অবলম্বন করেছেন! সুতরাং কুরআন করীম তার পঁচিশটি জায়গায় 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটিকে 'রূহ্ কব্‌য' তথা আত্মাকে ধারণ করার অর্থে ব্যবহার করেছে এবং সবক্ষেত্রে সুস্পষ্টত এ মর্মে নিজস্ব বাক্‌ধারা প্রকাশ করেছে যে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটির অর্থ হলো নিথর দেহকে ছেড়ে (বা বাদ দিয়ে) কেবল রূহকে কবয বা ধারণ করা। কিন্তু এ মহোদয়রা (খোদা তা'লা এঁদের হিদায়াত দিন) কুরআন করীমের তেইশটি জায়গায় উল্লিখিত অর্থই তো গ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু সেই স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে, যেখানে হযরত মসীহ্‌র ওফাত অর্থাৎ মৃত্যুর উল্লেখ রয়েছে, সেসব জায়গায় নিজপক্ষ থেকে (স্বেচ্ছাচারিতা মূলকভাবে) অন্যরকম অর্থ দাঁড় করেন। কাজেই লক্ষ্য করা উচিত, পবিত্র কুরআন-হাদীসের মূল ভাষ্যসমূহের (সুপ্রতিষ্ঠিত) প্রকৃত অর্থ থেকে মুখ তারা ফিরিয়েছেন, না আমরা? তবে হাদীসের বর্ণিত 'ইবনে মরিয়মে'র 'নুযুল' (বা অবতরণ) দ্বারা আমাদের দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে 'ইবনে মরিয়ম' (ঈসা আলাইহিস সালাম)-কে বুঝায় না। কিন্তু এ কারণে প্রতীয়মান হয় না যে, আমরা মূল ভাষ্যকে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে 'বাতিন' তথা রূপক অর্থের দিকে ঘুরিয়েছি। বরং ইলহামে-ইলাহী (বা ঐশীবাণী) ছাড়াই উল্লিখিত 'ইস্তিআরা' (উপমা) এ কারণে মানতে হয় যে, কুরআন করীম ও সহীহ্ হাদীসাবলী একে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণে বাধা দেয়। অতএব, বার বার আমরা সংশ্লিষ্ট স্বতঃস্পষ্ট দলিল-প্রমান সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে এসেছি। আর কতোবার সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা যায়?!

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" ('নূরুল হক', খণ্ড ১, পৃ. ৫)

জুমুআর খুতবা

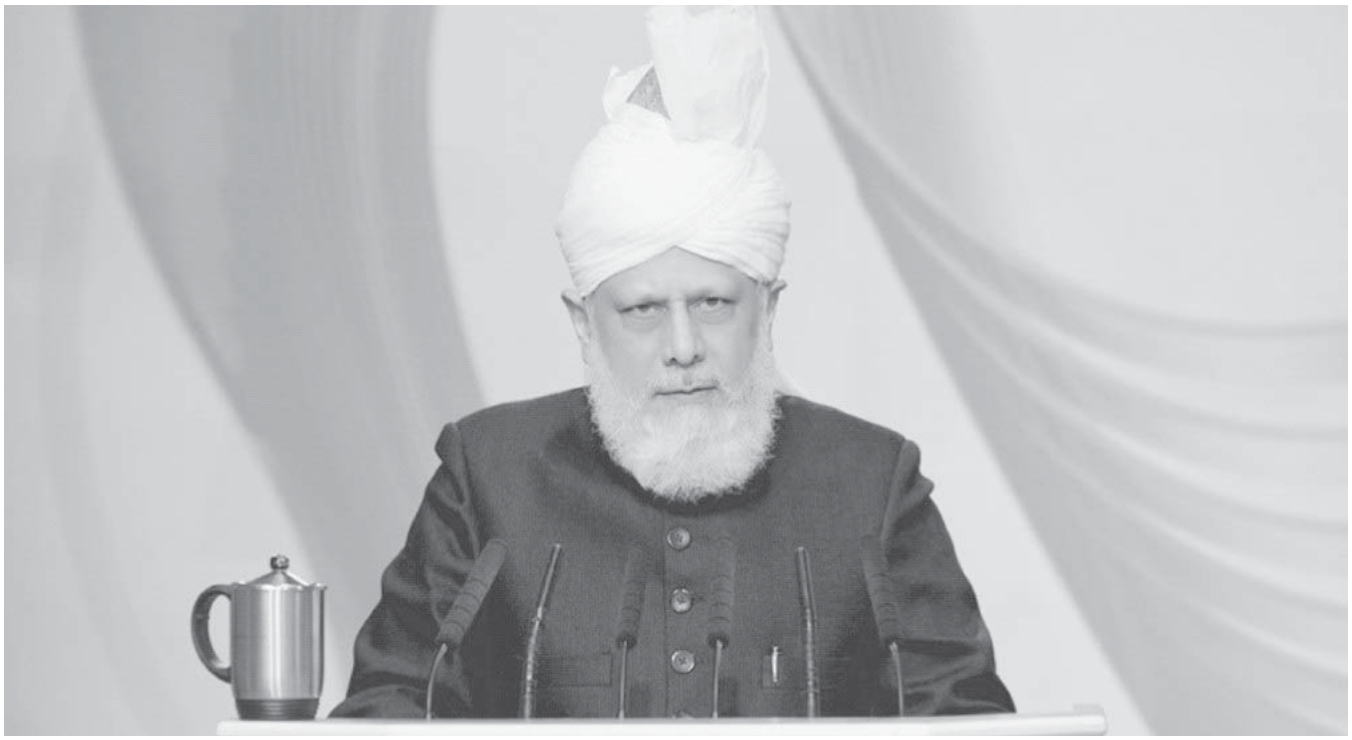

নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী নীতিমালা

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ জানুয়ারি, ২০১৭ মোতাবেক ১৩ সুলাহ্ ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কিছু মানুষ মনে করে, ধর্ম এবং মাযহাব স্বাধীনতা খর্ব করে তাদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। কিন্তু কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, "ওয়ামা জায়ালা আলাইকুম ফিদ্দীনে মিন হারাজ" (সূরা আল হাজ্জ: ৭৯) অর্থাৎ, ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের উপর কোন কষ্টদায়ক বা কোন অসহনীয় বিষয় চাপানো হয় নি, বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য মানুষের বোঝা কেবল লাঘব করাই নয়, বরং তাকে সকল প্রকারের সমস্যা এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা। অতএব, খোদার এ নির্দেশে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই ধর্ম অর্থাৎ, ইসলাম ধর্ম, যা তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে এমন কোন নির্দেশ বা আদেশ-নিষেধ নেই, যা তোমাকে সমস্যার মুখে ঠেলে দিতে পারে। বরং ছোট থেকে ছোট এবং বড় থেকে বড় প্রতিটি নির্দেশ রহমত বা কল্যাণ বয়ে আনে। অতএব, এটি মানুষের চিন্তাধারার বিভ্রান্তি। খোদার কথা বা বাণী ভুল হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি হয়ে যদি আমরা তাঁর নির্দেশাবলী অনুসারে জীবনযাপন না করি, তাহলে আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করব বা আমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হব। মানুষ বিবেকবুদ্ধি না খাটালে শয়তান যে প্রথম দিন থেকেই এই প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে, 'আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করব', এভাবে সে মানুষকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিবে। অতএব, শয়তানের হামলা থেকে মুক্ত থাকতে হলে খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলা আবশ্যক। কিছু বিষয় এমন আছে, আপাতদৃষ্টিতে যা অনেক তুচ্ছ মনে হয় আর কালের প্রবাহে সেগুলোকে তুচ্ছ এবং সামান্য মনে করার কারণে সেগুলোর ফলাফল অত্যন্ত ভয়ানক রূপ ধারণ করে। তাই আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশকেই তুচ্ছ জ্ঞান করা মু'মিনের উচিত নয়।

এ যুগে আমরা দেখি, স্বাধীনতা এবং ফ্যাশনের নামে নর-নারীদের মাঝে সর্বত্র নগ্নতা ছড়িয়ে পড়ছে। উন্নত হওয়ার লক্ষণ হল, প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া, তাই লজ্জাবোধ নামের কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আর এটা জানা কথা যে, এর কুফল আমাদের ছেলেমেয়েদের উপরও পড়বে, বিশেষ করে, যারা এখানে বসবাস করে আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছেও।

আজকাল আমরা দেখি, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সড়ে গিয়েছে। আর এ কারণেই তাদের ভালো-মন্দের মাপকাঠি ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ যুগে আমরা দেখি, স্বাধীনতা এবং ফ্যাশনের নামে নর-নারীদের মাঝে সর্বত্র নগ্নতা ছড়িয়ে পড়ছে। উন্নত হওয়ার লক্ষণ হল, প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া, তাই লজ্জাবোধ নামের কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আর এটা জানা কথা যে, এর কুফল আমাদের ছেলেমেয়েদের উপরও পড়বে, বিশেষ করে যারা এখানে বসবাস করে আর কোন কোন ক্ষেত্রে এ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছেও।

যৌবনে পদার্পণ করতেই কতক মেয়ে আমাকে লিখে যে, ইসলামে পর্দা করা আবশ্যক কেন? কেন আমরা টাইটফিট জিন্স এবং ব্লাউজ পড়ে বোরকা ছাড়াই ঘর থেকে বাহিরে যেতে পারি না? ইউরোপের স্বাধীন মেয়েদের মত কেন আমরা পোশাক পরিধান করতে পারব না?

প্রথমত সব সময় আমাদেরকে যে কথাটি স্মরণ রাখতে হবে তা হল, যদি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়, তাহলে আমাদেরকে ধর্মীয়-শিক্ষা মেনে চলতেই হবে। আমরা মুসলমান এবং আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এটি ঘোষণা দিতে হলে অবশ্যই ধর্মের অনুসরণ করতে হবে। এজন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী মেনে চলা এবং সে অনুসারে কাজ করা আবশ্যক। মহানবী (সা.) বলেছেন, "লজ্জাবোধ ঈমানের অংশ।" (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব আমরুল ঈমান, হাদীস ৯)

অতএব, ঈমান রক্ষা করার জন্য আমাদের শালীন পোশাক এবং পর্দা আবশ্যক। উন্নত বিশ্ব স্বাধীনতা এবং উন্নতির নামে লজ্জাশীলতাকে যদি জলাঞ্জলী দেয়, তাহলে এর পিছনে কারণ হল, এরা ধর্ম থেকেও অনেক দূরে সড়ে গেছে। অতএব, আহমদী এক মেয়ে, ছেলে, পুরুষ বা মহিলা, যে-ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে, সে এই অঙ্গীকার করেছে যে, আমি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেব। আর এই প্রাধান্য দেয়া বা অগ্রগণ্য করা তখনই সম্ভব হবে, যদি ধর্মের সেই শিক্ষা অনুসারে সে আমল করে। এটিও আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, প্রতিটি কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সম্মুখে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। এই পর্দাহীনতা এবং নির্লজ্জতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.) লিখেন, "ইউরোপের মত পর্দাহীনতার উপরই মানুষ জোর দিচ্ছে, কিন্তু এটি মোটেই শোভনীয় নয়। লাগামহীন এই স্বাধীনতাই অবাধ্যতা, অনাচার এবং কদাচারের উৎপত্তিস্থল। যেসব দেশে এমন লাগামহীন স্বাধীনতা বিরাজমান, তাদের চারিত্রিক অবস্থা একটু চিন্তা কর। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং পর্দাহীনতার কারণে যদি তাদের সম্ভ্রম ও পবিত্রতার মান উন্নত হয়, তাহলে মেনে নিব যে, আমরা ভ্রান্তিতে রয়েছি। কিন্তু এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, নর-নারী যখন যৌবনে পদার্পন করে আর একই সাথে স্বাধীন এবং পর্দাহীন হয়, তখন তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়। কামলোলুপ দৃষ্টি এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরাস্থ হওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য। পর্দার ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে মানুষ অনাচার, কদাচার এবং লাম্পট্যে লিপ্ত হয়ে যায় আর স্বাধীনতা যেখানে লাগামহীন, সেখানে কী না হবে? পুরুষদের অবস্থা একটু বিশ্লেষণ কর, তারা কিভাবে বল্গাহীন ঘোড়ার মত হয়ে গেছে। খোদাভীতিও নেই আর পরকালের বিশ্বাসও নেই। জাগতিক ভোগবিলাসকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে রেখেছে।

তাই সর্বপ্রথম যা আবশ্যক তা হল, এই স্বাধীনতা, পর্দাহীনতার পূর্বে পুরুষদের চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন কর। যদি এর সংশোধন হয়ে যায়, পুরুষদের ভিতর যদি এতটা শক্তি এসে যায়, যার ফলে তারা রিপুর তাড়নার শিকার হবে না, তবে এ বিতর্কের সূত্রপাত করতে পার যে, পর্দা আবশ্যক, নাকি না? নতুবা বর্তমান অবস্থায় এ কথার উপর জোর দেয়া যে, স্বাধীনতা চাই, পর্দার প্রয়োজন নেই- এটি বাঘের সামনে ছাগল উপহার দেয়ার নামান্তর। এদের কী হয়েছে যে, কোন কথার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে না। অন্ততঃপক্ষে এদের বিবেকবুদ্ধি তো খাটানো উচিত। পুরুষদের কি এতটা সংশোধন হয়ে গেছে যে, পর্দা খুলে মহিলাদেরকে তাদের সামনে উপস্থিত করা যেতে পারে?" (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-১৩৫, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

যে সমস্ত পাপ আজকের সমাজে আমাদের চোখে পড়ে, তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি কথার সত্যায়ন করে। অতএব, আহমদী প্রত্যেক মেয়েছেলে এবং নরনারীকে নিজেদের লজ্জাশীলতার মান উন্নত করে সমাজের নোংড়ামী থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত। এ প্রশ্ন হওয়া উচিত নয় বা এ বিষয়ে হীনমন্যতার শিকার হয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয় যে, পর্দা কেন আবশ্যক? কেন আমরা টাইটফিট জিন্স এবং ব্লাউজ পড়তে পারব না। এটি পিতামাতা, বিশেষ করে মায়েদের দায়িত্ব যে, ছোটকাল থেকেই ছেলেমেয়েদেরকে ইসলামী-শিক্ষা এবং সমাজের পাপ সম্পর্কে অবহিত করা। কেবল তবেই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর নামসর্বস্ব উন্নত সমাজের বিষবাষ্প থেকে তারা মুক্ত থাকতে পারবে। এ সব সমাজে বসবাস

করে সন্তানসন্ততিকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে এবং লজ্জাশীলতার সুরক্ষা ও হেফাজতের জন্য অনেক বড় সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। এর জন্য নিজেদের উন্নত নমুনাও প্রদর্শন করতে হবে।

অনুরূপভাবে, সম্প্রতি এক মেয়ে আমাকে পত্র লিখেছে যে, আমি অনেক বেশি পড়ালেখা করেছি, ব্যাংকে ভালো চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি জানতে চাই, সেখানে যদি পর্দা এবং হিজাবের উপর বিধি-নিষেধ থাকে আর কোট পরিধানের অনুমোতিও যদি না থাকে, তাহলে আমি কী এ চাকরি করতে পারব? কাজ থেকে বেড়িয়েই পর্দা করব। সে আরো লিখে যে, আমি শুনেছি আপনি বলেছেন, যেসমস্ত মেয়েরা চাকরি করে, তারা তাদের চাকরি-স্থলে বোরকা বা হিজাব শিথিল করে বা খুলে চাকরি বা কাজ করতে পারে। এই মেয়ের ভিতর কমপক্ষে এতটা সততা রয়েছে যে, সে এটিও লিখেছে যে, আপনি নিষেধ করলে আমি চাকরি করব না। এটি আমি এজন্যই ব্যাখ্যা করছি যে, এমন একজনেরই নয়, বরং বেশ কয়েকজন মেয়ের একই প্রশ্ন। তাই প্রথম কথা হল, আমি যদি এটি বলে থাকি, অনেক ক্ষেত্রে অনেক পরিস্থিতিতে ডাক্তারদের সীমাবদ্ধতা থাকে, সেখানে ঐতিহ্যগত বোরকা বা হিজাব পড়ে কাজ করা সম্ভব নয়। যেমন, অপারেশনের সময় তাদের পোশাক এমন হয়ে থাকে যে, মাথায় টুপি থাকে, মাস্ক থাকে আর ঢিলেঢালা গাউন পরিধান করে। এছাড়া ডাক্তাররাও পর্দার ভেতর থেকে কাজ করতে পারে। রাবওয়াতে আমাদের ডাক্তার ফাহমিদা সাহেবা ছিলেন, তাকে সব সময় আমরা পর্দায় আবৃত অবস্থায় দেখেছি। ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবাও ছিলেন। খুবই ভালো পর্দা করতেন। তিনি ইংল্যান্ডেও পড়ালেখা করেছেন আর প্রত্যেক বছর নতুন গবেষণা অনুসারে যোগ্যতার মানকে উন্নত করার জন্য লন্ডনেও আসতেন। কিন্তু সব সময় পর্দার ভেতর ছিলেন, বরং তিনি পর্দার অনুশাসন আবশ্যিক মানেরও বেশি মেনে চলতেন। এখানকার কোন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে কখনো আপত্তি করে নি, তার কাজ সম্পর্কে কেউ আপত্তি করতে পারে নি আর তার পেশাদারী দক্ষতাও এতে ব্যাহত হয় নি। তিনি অনেক বড় বড় অপারেশনও করেছেন। তাই, ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলার সদিচ্ছা থাকলে পথও পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে, নারী গবেষকদেরকে আমি বলেছিলাম, কোন মেয়ে যদি এত মেধাবী হয় যে, সে যদি গবেষণা করে আর গবেষণাগারে তাকে বিশেষ পোশাক পরিধান করতে হয়, সেখানে হেজাব না নিয়েও সেই পরিবেশের পোশাক সে পরিধান করতে পারে। সেখানেও অর্থাৎ, গবেষণাগারে তারা টুপি পড়ে, কিন্তু বাহিরে বের হতেই সেই পর্দা করা উচিত, ইসলাম যার নির্দেশ দিয়েছে। ব্যাংকের চাকরি এমন কোন চাকরি নয়, যার মাধ্যমে মানব সেবা হতে পারে। তাই, সাধারণ চাকরির ক্ষেত্রে পর্দা শিথিল করা বা পর্দা না করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। অথচ এটি এমন চাকরি, যেখানে সে নৈমিত্তিক (Casual) পোশাকে এবং মেইকআপে থাকবে। এমন চাকরিস্থলের জন্য বিশেষ কোন পোশাক নেই। তাই স্মরণ রাখতে হবে যে, লজ্জাবোধের সুরক্ষার জন্য শালীন পোশাক পরিধান করা আবশ্যক। আর এখন পর্দার যে প্রচলিত রীতি রয়েছে, তা শালীন পোশাকেরই একটি রূপ। পর্দার ক্ষেত্রে আপনি যদি শৈথিল্য দেখান, তাহলে অনেক অজুহাত ও বাহানা করে শালীন পোশাকও আপনি সংক্ষিপ্ত করতে থাকবেন আর এই সমাজের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিবেন। পূর্ব থেকেই এখানে নির্লজ্জতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুবাদী মানুষ অনেক আগে থেকেই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত যে, যারা নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করে, বিশেষ করে মুসলমান, তাদেরকে কিভাবে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয়া যায়। সুইজারল্যান্ডে এক মেয়ে মামলা করে যে, ছেলেদের সাথে সাঁতার কাটতে আমি অস্বস্তিবোধ করি। স্কুল আমাকে ছেলেদের সাথে একত্রে সাঁতর কাটতে বাধ্য করে। আমাকে মেয়েদের সাথে পৃথকভাবে সাঁতরানোর অনুমতি দেয়া হোক। মানবাধিকার কর্মী, যারা মানবাধিকারের বড় পতাকাবাহী সাজে, তারা বলে, তুমি পৃথক সাঁতার কাটতে চাও ভালো কথা, এটি তোমার ব্যক্তিগত অধিকার, কিন্তু এটি এমন বড় কোন ইস্যু নয়, যার জন্য তোমার পক্ষে রায় দেয়া যেতে পারে। যেখানে ইসলামী শিক্ষা এবং নারীর লজ্জাশীলতার প্রশ্ন আসে, সেখানে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন অজুহাত তালাশ করে। এমন পরিস্থিতিতে আহমদীদেরকে পূর্বের চেয়ে বেশি সাবধান হতে হবে। কোন কোন দেশে স্কুলে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য যদি সাঁতার কাটা আবশ্যক হয়ে থাকে, তাহলে মেয়েরা সাঁতারের পুরো পোশাক, যাকে বুরকিনী (Burkini) বলা হয়, তা পরিধান করে সাঁতার কাটবে, অবশ্য মেয়ে যদি অল্প বয়স্কা হয়। তাদের মাঝে যেন এই সচেতনতা সৃষ্টি হয় যে, আমাদেরকে শালীন পোশাক পরিধান করতে হবে। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদেরকে বুঝানো যে, ছেলে এবং মেয়েদের সাঁতার পৃথক পৃথক স্থানে হওয়া উচিত আর এর জন্য যতটা সম্ভব চেষ্টাও করা উচিত।

ইসলাম-বিরোধী অপশক্তিগুলো মুসলমানদের মধ্য থেকে ধর্মীয় শিক্ষা এবং মূল্যবোধ ধ্বংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। এরা এই অপচেষ্টায় লিপ্ত যে, বাক-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে ধর্মকে যেন এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়, যাতে করে তাদের বিরুদ্ধে কেউ এই আপত্তি করতে না পারে যে, দেখ! বাহুবলে ধর্মকে ধ্বংস করছে। বরং তাদেরকে যেন সহমর্মী মনে করা হয় আর তারা যেন শয়তানের মত সজ্জন সেজে ধর্মের উপর হামলা করে। কিন্তু আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কাজেই, এর জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে আর কষ্টও সহ্য করতে হবে। আমরা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হব না, কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে এদের সাথে বোঝাপড়াও করতে হবে। আজকে আমরা যদি তাদের একটি কথা গ্রহণ করি, যার সম্পর্ক আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার সাথে, তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের অনেক কথা আর অনেক শিক্ষার উপর বিধি-নিষেধ আরোপিত হতে থাকবে। দোয়ার উপরও আমাদের জোর দিতে হবে, যেন খোদা তা'লা আমাদেরকে এ সমস্ত শয়তানী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করার শক্তি ও মনোবল দান করেন এবং সাহায্য করেন। আমরা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি

অতএব, আহমদী এক মেয়ে, ছেলে, পুরুষ বা মহিলা, যে-ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে, সে এই অঙ্গীকার করেছে যে, আমি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেব। আর এই প্রাধান্য দেয়া বা অগ্রগণ্য করা তখনই সম্ভব হবে, যদি ধর্মের সেই শিক্ষা অনুসারে সে আমল করে।

আর অবশ্যই আমরা সত্যের উপর রয়েছি, তাহলে আমাদের বিজয় একদিন অবশ্যই আসবে। ইসলামী-শিক্ষাই পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে। এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "সত্যের ভেতর এক সৎসাহস এবং বীরত্ব থেকে থাকে। মিথ্যাবাদী ভীরু হয়। যার জীবন অপবিত্রতা, নোংরা এবং পাপে কলুষিত, সে সব সময় ভীত-ত্রস্ত থাকে আর মোকাবেলা করার সাহস রাখে না। এক সত্যবাদী মানুষের মত সে বীরত্ব এবং সাহসিকতার সাথে নিজের সত্যতা প্রকাশ করতে পারে না আর নিজের পবিত্রতার প্রমাণও দিতে পারে না। জাগতিক বিষয়েই তোমরা চিন্তা করে দেখ! এমন কে আছে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা সামান্য স্বচ্ছলতা দান করলে তার কোন হিংসুক থাকে না। সঙ্গতিশীল প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই হিংসুক হয়ে থাকে আর তার পিছনে লেগে থাকে। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শয়তানও সংশোধনের শত্রু। তাই মানুষের উচিত, নিজের হিসাব পরিষ্কার রাখা, খোদার সাথে লেনদেন স্বচ্ছ রাখা, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট রাখা, কাউকে ভয় না করা এবং কারো তোয়াক্কা না করা আর এমন বিষয়াদিও এড়িয়ে চলা উচিত, যার ফলে সে নিজেই শাস্তির শিকার হতে পারে। কিন্তু এগুলোর কিছুই অদৃশ্য সত্তার সাহায্য এবং খোদা-প্রদত্ত তৌফিক ছাড়া সম্ভব নয়। নিছক মানবীয় প্রচেষ্টা কোন কিছু করতে পারে না, যতক্ষণ খোদার কৃপা সাথি না হবে। "খুলিকাল ইনসানু যয়িফা" (সূরা আর নিসা: ২৯) অর্থাৎ, মানুষ অক্ষম ও দুর্বল, ভুলভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ এবং চতুর্দিক থেকে সমস্যা কবলিত। তাই দোয়া করা উচিত, খোদা তা'লা যেন পুণ্যকর্ম করার তৌফিক দেন আর অদৃশ্য-সাহায্য এবং কৃপারাজির উত্তরাধিকারী করেন।" (মলফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৫২, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

সুতরাং দোয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে আমাদের মানাতে হবে আর এর জন্য খোদার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, অন্যান্য ধর্ম চিরস্থায়ী নয়। নিজ নিজ সময়ে এসেছে আর স্বীয় যুগের শিক্ষামূলক চাহিদা পূরণ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে জন্যই তাদের ধর্মীয় পুস্তকাবলীতে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। কিন্তু সেগুলোর মাঝে ইসলামই আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে আর ইসলাম চিরস্থায়ী ধর্ম এবং কুরআনী শিক্ষা চিরকালের জন্য। তাই কোন হীনমন্যতার শিকার না হয়ে আমাদের শিক্ষার উপর অনুশীলন এবং আমলের চেষ্টা করা উচিত আর এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। অন্যদেরকেও বলা উচিত যে, তোমরা যেসব কথা বল, তা খোদার ইচ্ছার পরিপন্থী আর তা ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে।

ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয়, যা উদ্ভট বিধি-নিষেধের শিকলে মানুষকে আবদ্ধ করবে। প্রয়োজন অনুসারে এর শিক্ষায় ছাড়ও রয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, কিছু রোগ-ব্যাধি এমন আছে, যা চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তারকে দেখাতে হয়। এই ক্ষেত্রে ডাক্তার বা রোগীর জন্য ছাড় রয়েছে, এখানে পর্দার ক্ষেত্রে কঠোরতা করা হয় নি। মানবজীবন রক্ষা এবং মানবজীবনকে কষ্টমুক্ত করা হল এর প্রধান উদ্দেশ্য। সেই কারণেই সমস্যার সময় বা বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে মৃত প্রাণী এবং শুকরের মাংস খাওয়ারও অনুমতি রয়েছে। কিন্তু তা যদি জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, তবেই। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন ঔষধে এলকোহল (alcohol) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যেভাবে শয়তানী অপশক্তি আমাদেরকে পরিচালিত করতে চায়, সেক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য হল, ধীরে ধীরে ধর্মীয় সীমারেখা মুছে দেয়া এবং ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করা আর এর বিরুদ্ধে আমাদের আহমদীদেরকেই জিহাদ করতে হবে। আর এটি তখন সম্ভব, যদি আমরা ইসলামী শিক্ষাকে সবকিছুর উপর গুরুত্ব দেই আর খোদার সামনে ঝুঁকি এবং বিনত হই, যাতে আমাদের সাফল্য আসে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তরবারির কোন জিহাদ নেই, বরং প্রবৃত্তির সংশোধনের জিহাদ রয়েছে। বিশেষ করে এসব উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী মুসলমান আর মোটের উপর পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মুসলমান, বিশেষ করে আহমদী মুসলমানরা আমার সম্বোধিত। তাদের উচিত, দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং দেশের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করা আর যেভাবেই হোক দেশের উন্নতির জন্য খিদমত করা বা সেবার উন্নত মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা। এটি যদি হয়, তাহলে শয়তানী অপশক্তির মুখ বন্ধ হয়ে যাবে আর এটি বলতে বাধ্য হবে যে, এরা এমন মুসলমান, যারা দেশ ও জাতিকে উন্নতি ও অগ্রগতির প্রকৃত গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সচেষ্ট থাকে। এরা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে না। এদেরকে এবং বিভিন্ন সরকারকে মানাতে হবে যে, আমাদের ধর্মীয়-শিক্ষার কারণে আমরা যদি কোন বিষয়কে নিজেদের জন্য বিধিবদ্ধ করে নেই বা কোন কিছু মেনে চলি, তাহলে সেই বিষয়ে সরকার বা আদালতের নাক গলানোর কোন প্রয়োজন নেই। এর ফলে হৃদয়ে অশান্তি ও অস্বস্তি দানা বাঁধবে। স্থানীয় লোকদের মাঝে এবং অভিবাসীদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হবে। যাদেরকে তারা মুহাজের বলে, যদিও এখন তাদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম এখানে বসবাস করছে। হ্যাঁ, তারা যদি দেশের কোন ক্ষতি করে, দেশের প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং দেশের মাঝে মিথ্যা ও ঘৃণার বিস্তার ঘটায়, তাহলে তাদেরকে ধরে শাস্তি দেয়ার অধিকার সরকারের আছে। কিন্তু ধর্মীয়

কোন শিক্ষা মানতে বারণ করে এটি বলা সঠিক নয় যে, এরূপ করলে এর অর্থ হবে, দেশীয় সমাজের মূল ধারায় তোমরা অঙ্গীভূত হচ্ছো না।

আহমদীদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই যুগ খুবই ভয়াবহ এক যুগ। শয়তান চতুর্দিক থেকে ভয়াবহ হামলা করছে। মুসলমান, বিশেষ করে আহমদী নর-নারী, যুবক-যুবতী নির্বিশেষে সকলেই যদি ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা না করেন, তাহলে আমাদের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই, বরং আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির অন্যদের চেয়ে আমরা শিকার বেশি হব। কেননা, আমরা সত্য বুঝেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, তাসত্ত্বেও আমরা তা মেনে চলি নি। অতএব, আমরা যদি নিজেদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই, তবে প্রতিটি ইসলামী-শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস নিয়ে পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে হবে। এই কথা মনে করবেন না যে, এসব উন্নত দেশের উন্নতি আমাদের অগ্রগতি এবং আমাদের জীবনের নিশ্চয়তা দিবে আর এগুলোর অন্ধ অনুকরণের মাঝেই বুঝি আমাদের জীবন নিহিত। এসব উন্নত দেশের উন্নতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এদের চরিত্রের যা অবস্থা বা এদের নৈতিকতা-বিবর্জিত কর্মকাণ্ড এদেরকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর এর লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে। খোদার ক্রোধকে এরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং ধ্বংসকে এরা হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এমন পরিস্থিতিতে মানবিক সহমর্মিতার বশবর্তী হয়ে সঠিক রাস্তার দিকে ডেকে তাদেরকে রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। গড্ডালিকা প্রবাহে বয়ে যাওয়ার পরিবর্তে এমনটি করতে হবে। এদের সংশোধন যদি না হয়, যা এদের অহংকার এবং ধর্মের সাথে দূরত্বের কারণে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হয়, তাহলে পৃথিবীর উন্নতির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সেসব জাতি ভূমিকা পালন করবে, যারা চারিত্রিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

অতএব, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, আমাদেরকে, বিশেষ করে যুবক-শ্রেণিকে আল্লাহ্‌র শিক্ষা সম্পর্কে ভাবতে হবে। জাগতিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে এর অন্ধ অনুকরণ করার পরিবর্তে জগদ্বাসীকে আপনার পেছনে চালানোর চেষ্টা করুন। পর্দা এবং পোশাকের বরাতে কথা আরম্ভ করেছিলাম। এই প্রেক্ষাপটে এটিও বলতে চাই আর পরিতাপের সাথে বলতে চাই যে, 'কেউ কেউ বলে, ইসলাম এবং আহমদীয়াতের উন্নতি কি কেবল পর্দার উপরই নির্ভরশীল? এই শিক্ষা এখন সেকেলে। আর জগদ্বাসীর মোকাবেলা যদি করতে হয়, তাহলে এগুলো আমাদেরকে পরিহার করতে হবে' (নাঊযুবিল্লাহ্)। কিন্তু এমন লোকদের সামনে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, দুনিয়ার কীটদের পদাঙ্ক অনুসরণ যদি করেন আর তাদের মত জীবন যাপন করেন, তাহলে এই পৃথিবীর মোকাবেলা করার পরিবর্তে নিজেরাই জাগতিকতায় নিমজ্জিত হবেন। আর ধীরে ধীরে নামাযেরও কেবল বাহ্যিকতাই অবশিষ্ট থাকবে বা অন্য কোন পুণ্য যদি করেন বা ধর্মীয়-শিক্ষা মেনে চলেন, এর বাহ্যিক দিকগুলোই কেবল অবশিষ্ট থাকবে আর তাও ধীরে ধীরে মুছে যাবে।

অতএব, খোদার কোন নির্দেশকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। এটি সত্যিই ভয়ঙ্কর একটি বিষয়। ইসলামের উন্নতির জন্য প্রত্যেক সেই বিষয় আবশ্যক এবং অবধারিত, যার নির্দেশ খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.) দিয়েছেন। পর্দার কঠোরতা শুধু নারীদের জন্যই নয়। ইসলামী বিধি-নিষেধ কেবল নারীদের জন্যই নয়, বরং নরনারী উভয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে পুরুষদের শালীনতা ও লজ্জাশীলতা এবং পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

(সূরা আন্ নূর: ৩১)

অর্থাৎ, তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটি তাদের জন্য সর্বাধিক পবিত্রতার কারণ। নিশ্চয় তোমরা যা কর, তা সম্পর্কে তিনি সম্মক অবগত আছেন।

মু'মিন পুরুষকে আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে সম্বোধন করেছেন যে, দৃষ্টি অবনত রাখ, কেননা 'যালিকা আযকা লাহুম' এটি তাদের পবিত্রতার জন্য আবশ্যক। যদি পবিত্রতা না থাকে, তাহলে খোদা লাভ হয় না। তাই মহিলাদের পর্দার কথা বলার পূর্বে পুরুষকে বলেছেন যে, প্রত্যেক এমন বিষয়, যার ফলে তোমাদের উগ্র কামনা বাসনা জাগ্রত হতে পারে, তা এড়িয়ে চল। মহিলাদেরকে বাঁধাহীনভাবে দেখা, তাদের মাঝে উঠাবসা করা, নোংরা চলচ্চিত্র দেখা, না-মাহরামদের সাথে ফেসবুক (facebook) বা অন্য কোন মাধ্যমে চ্যাট (chat) করা, এই বিষয়গুলো পবিত্রতাকে পদদলিত করে। সে কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বেশ কয়েক স্থানে এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে নসীহত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, "এটি খোদার উক্তি। তিনি তাঁর উন্মুক্ত এবং অতি স্পষ্ট বিবৃতির মাধ্যমে আমাদের প্রতিটি কথা, কর্ম, উঠাবসা, চলা-ফেরায় নির্দিষ্ট সুবিদিত সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর মানবিক শিষ্টাচার ও পবিত্র রীতিনীতি শিখিয়েছেন। চোখ, কান, জিহ্বা, ইত্যাদি অঙ্গের হিফাযতের জন্য তিনি অতীব তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

(সূরা আন্ নূর: ৩১)

অর্থাৎ মু'মিনদের উচিত, তাদের চোখ, কান এবং লজ্জাস্থানকে না-মাহরাম থেকে হিফাযত করা, প্রত্যেক অদর্শনীয় এবং যা শোনা এবং দেখার যোগ্য নয়, তা শোনা ও দেখা থেকে বিরত থাকা। আর এ রীতি তাদের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বয়ে আনবে। অর্থাৎ, তাদের হৃদয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত থাকবে। কেননা, অধিকাংশ কামনা-বাসনায় উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য এবং পাশবিক শক্তিবৃত্তিকে অপকর্মে লিপ্তকারীর জন্য এসব অঙ্গই দায়ি। এখন দেখুন, পবিত্র কুরআন না-মাহরাম থেকে নিরাপদ থাকার কত তাকিদপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে এবং কত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, বিশ্বাসীরা যেন তাদের চোখ, কান এবং লজ্জাস্থানকে নিয়ন্ত্রণে রাখে আর অপবিত্রতার স্থান এবং

এ যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কাজেই, এর জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে আর কষ্টও সহ্য করতে হবে। আমরা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হব না বটে, তবে বুদ্ধি খাটিয়ে এদের সাথে বোঝাপড়াও করতে হবে। আজকে আমরা যদি তাদের একটি কথা গ্রহণ করি, যার সম্পর্ক আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক, তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের অনেক কথা আর অনেক শিক্ষার উপর বিধি-নিষেধ আরোপিত হতে থাকবে।

উপলক্ষকে যেন সর্বদা এড়িয়ে চলে।" (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯, টীকা)

দৃষ্টি অবনত রাখার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "দৃষ্টি অর্ধ উন্মিলিত রেখে অদর্শনীয় জায়গা দেখা থেকে আত্মরক্ষা করা আর যা দেখা বৈধ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার রীতিকে আরাবীতে 'গাজ্জে বসর' বলা হয়।" অর্থাৎ, অর্ধ উন্মিলিত দৃষ্টিতে যা দেখার অনুমতি আছে, তা দেখা এবং যা দেখা নিষিদ্ধ তা এড়িয়ে চলা আর বৈধ বিষয়াদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করাকে আরবীতে 'গাজ্জে বসর' বলা হয়। "আর পরহেজগার প্রত্যেক ব্যক্তি, যে হৃদয়কে পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখতে চায়, তার উচিত নয় পশুর মত লাগাম বিহীনভাবে এদিক-সেদিক দেখা বা তাকানো। বরং তার জন্য আধুনিক সভ্য যুগে দৃষ্টি অবনত রাখা আবশ্যিক করা হয়েছে। এটি সেই আশিসময় অভ্যাস, যার কল্যাণে তার এই স্বাভাবিক সহজাত অবস্থা উন্নত নৈতিকগুণে পর্যবসিত হবে আর তার সামাজিক জীবনও প্রভাবিত হবে না। নৈতিক এই চরিত্রকে বলা হয় এহ্সান বা সুরক্ষিত দূর্গ এবং ইফফাত বা সতীত্ব।" (ইসলামী উসুল কি ফিলোসুফি, রুহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪)

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, "মু'মিনদেরকে বলে দাও, তারা যেন না-মাহরাম এবং প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করার মত বিষয় দেখা থেকে চোখ এতটা বন্ধ রাখে, যেন চেহারা পুরোপুরি চোখে না পড়ে আর চেহারার ওপর যেন লাগামহীনভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে। চোখ পুরোপুরি উন্মিলিত না রাখার বিষয়টি যেন সে নিশ্চিত করে, কামনার দৃষ্টিতেও নয় আর কামনাহীন দৃষ্টিতেও নয়। কেননা, এমনটি করা চূড়ান্ত পর্যায়ের স্খলনের কারণ হয়। বিধি-নিষেধ মুক্ত অবস্থায় পবিত্রতা বজায় থাকে না আর অবশেষে মানুষ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। হৃদয় পবিত্র হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টি পবিত্র না হবে আর সেই পবিত্র মাকাম এবং মর্যাদা, যে পর্যায়ে সত্যান্বেষীর পদচারণা করা উচিত, তা অর্জিত হতে পারে না। এই আয়াতে এই শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, দেহের সেই সকল ছিদ্রের সুরক্ষা আবশ্যক, যে পথে পাপ অনুপ্রবেশ করতে পারে। 'ছিদ্র' শব্দ, যা এই আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে, এতে জননাঙ্গ, কান, নাক এবং মুখ সবই অন্তর্ভূক্ত। দেখ! এই সমূহ-শিক্ষা কত উন্নত মান এবং মহিমা-সম্মত, যার উপর অযৌক্তিক কোন জোর দেয়া হয় নি আর অতিরঞ্জিত বা অপ্রতুলতাও যাতে নেই আর প্রজ্ঞাপূর্ণ ভারসাম্যের ভিত্তিতে প্রতিটি কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতের পাঠক তাৎক্ষণিকভাবে অবগত হবে যে, লাগামাহীনভাবে দেখো না, দেখার অভ্যাস করো না, এর অর্থ হল, পরীক্ষায় পড়ে নর-নারী উভয়ের কেউই যেন কোন সময় স্খলিত না হয়।" (তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১৬৪-১৬৫)

অতএব, এই হল পুরুষদের জন্য ইসলামী-শিক্ষা আগে তাদের উপরই সকল অর্থে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এরপর মহিলাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এসব সাবধানতা সাপেক্ষে পর্দার বিষয়ে তোমাদেরকে যত্নবান থাকতে হবে। এ সব দেশ, যেখানে লজ্জাবোধ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে, আমরা কিভাবে বলতে পারি যে পর্দার প্রয়োজন নেই। পর্দাহীনতা এবং বন্ধুত্ব অনেক নোংরামীতে পর্যবসিত হচ্ছে, আমাদেরকে এগুলো থেকে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এর ফলে এটিও স্পষ্ট হয়ে গেল, মহিলাদের যদি পুরুষের সাথে সাঁতার কাটার অনুমতি না থাকে, তাহলে পুরুষদেরও মহিলাদের সাথে সাঁতার কাটার অনুমতি নাই।

অতএব, এ সব বিধি-নিষেধ কেবল নারীদের জন্য নয়, বরং পুরুষদের জন্যও বটে। মহিলাদেরকে দেখে পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়ে মহিলার সম্মানের হেফাযত করা হয়েছে। অতএব, ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, যা পাপের আশঙ্কা থেকে মানুষকে মুক্ত করে।

জার্মানিতে গত জলসা সালানার সময় মহিলাদের তাঁবুতে নর-নারীর পর্দার পার্থক্য, তাদের দায়িত্ব এবং তাদের কর্তব্য আর নারীর অধিকার সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, এতে এক জার্মান মহিলা এসেছিলেন, তিনি আমার পুরো বক্তৃতা শুনে বলেছেন, পূর্বে আমি মনে করতাম, ইসলাম মহিলাদের অধিকার পদদলিত করে। কিন্তু আজকে আপনার কথা শুনে আমি জানতে পেরেছি, ইসলাম নারীর অধিকার ও সম্মান অধিক সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা এবং প্রতিষ্ঠা করে। অতএব, কোন আহমদী মেয়ে বা ছেলে বা মহিলার কোন প্রকার হীনমন্যতার শিকার হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলামী শিক্ষাই পৃথিবীকে শান্তি-ধামে পরিণত

করবে আর খোদার দিকে আসার বিষয়টা নিশ্চিত করবে। জগৎ একদিন বুঝতে পারবে, ইসলামী-শিক্ষা নিয়ে ভাবা এবং মেনে চলা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখার এবং নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়ার পর মহিলাদেরকেও বিশদভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমাদেরকেও দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। আর এটি বলেছেন যে, পর্দা কিভাবে করতে হবে আর কাদের সামনে পর্দা করতে হবে। তোমরা যদি এই কথাগুলো মেনে চল, তাহলে সফল হবে। শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, পর্দা এবং লজ্জাবোধ তোমাদের সাফল্যের প্রতীক। এতে তোমাদের ইহকাল এবং পরকালের সাফল্য সুনিশ্চিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ
اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ
اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ
يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ
مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۭ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا
اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

(সূরা আন্ নূর: ৩২)

অর্থাৎ, আর তুমি মু'মিন নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করে এবং নিজেদের সাজগোজ ও সৌন্দর্য কেবল তা ছাড়া যেন প্রদর্শন না করে, যা আপনা থেকেই প্রকাশ পায় এবং তারা যেন তাদের মাথার কাপড় নিজেদের বুকের উপর টেনে নেয়, তারা যেন তাদের স্বামী অথবা তাদের পিতা অথবা তাদের স্বামীর পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের স্বামীর পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের ভাইয়ের ছেলে অথবা তাদের বোনের পুত্র অথবা তাদের নারী অথবা তাদের অধিকারভুক্তরা অথবা এরূপ পুরুষ পরিচারক, যারা দুষ্কর্মপ্রবণ নয় অথবা অল্পবয়স্ক শিশু, যারা এখনো নারীদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করে নি, এরা ছাড়া অন্য কারো সামনে নিজেদের সাজগোজ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন এমন ভঙ্গীতে না হাঁটে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। আর হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে বিনত হও, যেন তোমরা সফল হতে পার।

পুরুষ এবং নারী উভয়েরই দৃষ্টি সংযত রাখা এবং পর্দার মাধ্যমেই মানুষের সম্ভ্রম এবং সম্মানের সুরক্ষা হবে। উন্নত বিশ্বে বা উন্নত দেশগুলোতে সম্মান এবং সম্ভ্রমের হিফাযতের মানদণ্ডই বদলে গেছে। না-মাহরামদের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি ছেলে এবং মেয়ের ইচ্ছার অধিনে হয়, তাহলে সেটি ব্যভিচার নয়। আর যদি ইচ্ছার পরিপন্থি হয়, তাহলে সেটিকে ব্যভিচার আখ্যায়িত করা হয়। অধঃপতন যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছে, এমন ক্ষেত্রে খোদার আশ্রয়ের সন্ধানের জন্য এক মু'মিনের অনেক বেশি দোয়া করা উচিত।

ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যারা আপত্তি করে, তারা বলে– নারীকে পর্দায় আবৃত করে, তাকে পর্দা করতে বলে তার অধিকার পদদলিত করা হয়েছে আর এর ফলে অপরিপক্ক মনমানসিকতার কিছু মেয়ে কখনো প্রভাবিত হয়। পর্দা বলতে ইসলাম বন্দী-দশাকে বুঝায় না। গৃহের চার দেয়ালের মাঝে মহিলাকে আবদ্ধ করা এর উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ, লজ্জাবোধ নিশ্চিত করাই হল এর উদ্দেশ্য।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "আজকাল পর্দার উপর হামলা করা হয়। কিন্তু এরা জানে না যে, ইসলামী-পর্দার অর্থ গারদ (অর্থাৎ, কারাগার) নয়, বরং এতে একপ্রকার বাধা সৃষ্টি করা, যেন গায়ের মাহরাম নারী-পুরুষ পরস্পরকে দেখার সুযোগ না পায়। পর্দা থাকলে স্খলন থেকে রক্ষা পাবে। ন্যায়পরায়ণ এক ব্যক্তি অবশ্যই বলবে, নরনারী যেখানে নির্বিচারে লাগামহীনভাবে মেলামেশার এবং ভ্রমণের সুযোগ পায়, সেখানে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার শিকার হয়ে তারা হোচট যে খাবে না, তা কিভাবে বলা যায়? প্রায় সময় শোনা এবং দেখা গিয়েছে যে, এমন জাতিসমূহ অনাত্মীয় পুরুষ এবং মহিলার দরজা-বন্ধ করে এককক্ষে অবস্থান করাকে অশোভনীয় মনে করে না, যেন এটিই সভ্যতা! এ সব কুফল থেকে বাঁচার লক্ষ্যেই ইসলামী শরীয়তের প্রবর্তক ঐ সব বিষয়ের অনুমতিই দেন নি, যা কারো জন্য হোঁচট খাওয়ার কারণ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এভাবে গায়ের মাহরাম নরনারী যেখানে একত্রিত হয়, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি শয়তান হয়ে থাকে। এসব অপবিত্র পরিণতির বিষয়ে একটু চিন্তা কর, লাগামহীন শিক্ষার কারণে ইউরোপ আজ ভুগছে। অনেক জায়গায় পতিতাদের ন্যায় চরম লজ্জাষ্কর জীবন অতিবাহিত করা হচ্ছে। এগুলো এসব শিক্ষারই ফসল। খেয়ানত থেকে কোন কিছুকে বাঁচাতে চাইলে তার হেফাযত কর। যদি হেফাযত না কর আর এটি মনে কর যে, এরা ভাল মানুষ, তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, সেই জিনিস অবশ্যই ধ্বংস হবে। ইসলামী শিক্ষা কত পবিত্র শিক্ষা, যা নর-নারীকে পৃথক পৃথক রেখে স্খলন থেকে রক্ষা করেছে আর মানুষের জীবন অসহনীয় এবং তিক্ত করে তুলে নি, যে কারণে ইউরোপের গৃহে-গৃহে কলহ বিবাদ এবং আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোন কোন ভদ্র মহিলার পতিতা-সুলভ জীবন কাটানো এ অনুমতিরই একটি ব্যবহারিক ফল, যা অন্য মহিলাদেরকে দেখার জন্য দেয়া হয়েছে।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪-৩৫, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে প্রকাশিত)

পর্দার রীতি সম্পর্কে এরপর তিনি (আ.) বলেছেন, পর্দা কিভাবে করা উচিত? তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন– "বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন নিজেদের চোখ না-মাহরামদেরকে দেখা থেকে বিরত রাখে আর নিজেদের কানকেও না-মাহরামদের থেকে রক্ষা

আরেকটি কথা মুরব্বীদের এবং তাদের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তারাও যেন নিজেদের পোশাক এবং দৃষ্টি সংযত রাখার ক্ষেত্রে সাবধান থাকে। জামা'ত তাদের আমলী দৃষ্টান্ত দেখে থাকে। মুরব্বী এবং মুবাল্লেগদের স্ত্রীরা শিক্ষকই হয়ে থাকেন। সব বিষয়ে তাদের উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত।

করে, অর্থাৎ, তাদের কুরুচিপূর্ণ আলাপচারিতা যেন না শোনে। আর নিজেদের লজ্জা স্থানকে যেন ঢেকে রাখে। নিজেদের সৌন্দর্যপূর্ণ অঙ্গগুলো না-মাহরামের সামনে যেন উন্মুক্ত না করে। ওড়নাগুলো এমনভাবে টেনে রাখা উচিত, যেন মাথা হয়ে বক্ষ পর্যন্ত নেমে আসে অর্থাৎ, বুক, উভয় কান, মাথা আর মুখমণ্ডল যেন চাদরের পর্দায় আবৃত থাকে আর যেন নৃত্যশিল্পীর মত পা মাটিতে না মারে। এটি সেই রীতি, যা (মেনে চলা) স্খলন থেকে রক্ষা করতে পারে।" (ইসলামী উসুল কি ফিলোসুফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৩৪২)

এখানে আমি এ কথাও স্পষ্ট করতে চাই যে, কোন কোন মহিলা এ প্রশ্নের অবতারণা করে যে, আমরা মেইকআপ করে থাকি, মেইকআপকৃত চেহারা যদি ঢেকে নেয়া হয়, তাহলে মেইকআপ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পর্দা কিভাবে করব? প্রথমত মেইকআপ না করাই হল পর্দা, ন্যূনতম পর্দা, যার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন- চেহারার বেলায় ঠোঁট-মুখ খোলা থাকতে পারে, তবে মুখাবয়বের বাকী অংশ ঢাকতে হবে (রিভিউ অফ রিলিজিয়ন, ৪র্থ খণ্ড, সংখ্যা ১, পৃ. ১৭, জানুয়ারি ১৯০৫) আর মেইকআপ যদি করতেই হয়, তাহলে মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখতে হবে। এদের এটি ভাবা উচিত, খোদার শিক্ষা অনুসরণ করে সৌন্দর্য গোপন করবেন, না কি পৃথিবীর মানুষকে দেখাতে নিজের সৌন্দর্য এবং মেইকআপ মেলে ধরবেন।

সৌন্দর্য কাদের সামনে প্রকাশ করা যায়, এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। নিকটাত্মীয়, ভাইবোন, স্বামী, পিতা, তাদের সন্তানসন্ততির কথা বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে পর্দার প্রয়োজন নেই। মেইকআপ ইত্যাদি সাজসজ্জা তাদের সামনে প্রকাশ করা যেতে পারে, এর বাহিরে নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা প্রকাশ করেছেন আর সেইসব আত্মীয়স্বজনের কথাও আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। আর তা-ও সেই সব সৌন্দর্য, যা প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। যেমন, চেহারা, উচ্চতা, ইত্যাদি হল এই ধরণের সৌন্দর্য। এর অর্থ এটি নয় যে, তাদের সামনেও বা ঘরে টাইট জিন্স বা ব্লাউজ পড়ে বিচরণ করবে বা এমন পোশাক পড়বে, যার ফলে অন্য কোন কিছু প্রকাশ পায়। এমন আত্মীয়-স্বজনের সামনেও এ ধরণের পর্দা করা আবশ্যক।

অনুরূপভাবে, আরেকটি কথা মুরব্বীদের এবং তাদের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তারাও যেন নিজেদের পোশাক এবং দৃষ্টি সংযত রাখার ক্ষেত্রে সাবধান থাকে। জামা'ত তাদের আদর্শ দেখে থাকে। মুরব্বী এবং মুবাল্লেগদের স্ত্রীরা মুরব্বীই হয়ে থাকেন। সব বিষয়ে তাদের উন্নত-দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমাদের নরনারী যেন লজ্জাবোধের উন্নত মানে অধিষ্ঠিত থাকেন, উন্নত মান প্রতিষ্ঠাকারী হন আর আমরা সবাই যেন সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী-শিক্ষা মেনে চলি।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩-৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৫, পৃ. ৫-৮)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

[৩ পৃষ্ঠার ধারাবাহিকতায় টিকার অবশিষ্টাংশ]

তাদের পার্থিব শক্তির ক্ষয়, তাদের ধ্বংসযজ্ঞ এবং তাদের উৎসাহ দান, কোন কিছুই তাদেরকে তাদের সংশোধনের জন্য প্রবৃত্ত করতে পারে নি। তাদের অতীতের শয়তানী ক্রিয়াকলাপে তারা লেগেই ছিল। আল্লাহ তা'লার ক্রোধাগ্নি প্রায় আসন্ন হওয়ায় বনী ইসরাঈলকে তাদের পাপাচার ত্যাগ করার জন্য যিরমিয় নবী সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তারা এ নবীর সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত করে নি। জেহোয়াকিম এর শাসনকালে ব্যাবিলনের নেবুখদনিৎসর প্রথম আক্রমণে মিশরীয়দেরকে পরাজিত করে প্যালেস্টাইন দখল করে এবং অনেক ধর্মপ্রাণ গুণী ব্যক্তিকে ও ধনসম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে যায়, কিন্তু শহরটিকে বিজয়াক্রমণের ধ্বংসলীলা থেকে অব্যাহতি দেয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৭ সালেও প্যালেস্টাইন অবরুদ্ধ হয় এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। সিদকিয়ার বিদ্রোহীরা নেবুখদনিৎসরের সাহায্যে প্যালেস্টাইন দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে এবং অবরোধের দেড় বছর পরে আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণে শহরটি দখল করে নেয়। রাজা সিদকিয়া শহর ছেড়ে পলায়ন করে। কিন্তু তাকে বন্দী করা হয়। তার পুত্রদের হত্যা করা হয় এবং তার চোখ উৎপাটন করা হয় এবং বেড়ী লাগিয়ে তাকে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। ধর্মশালা, রাজপ্রাসাদ এবং শহরের বৃহৎ অট্টালিকাগুলো ভস্মীভূত করা হয়, প্রধান পুরোহিত ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে হত্যা করা হয় এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় (জেরুযালেম অধ্যায়ের অধীন যিউ এনসাইক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৫৫ পৃ: এবং ৭ম খণ্ড, ১২২ পৃ:)।

জুমুআর খুতবা

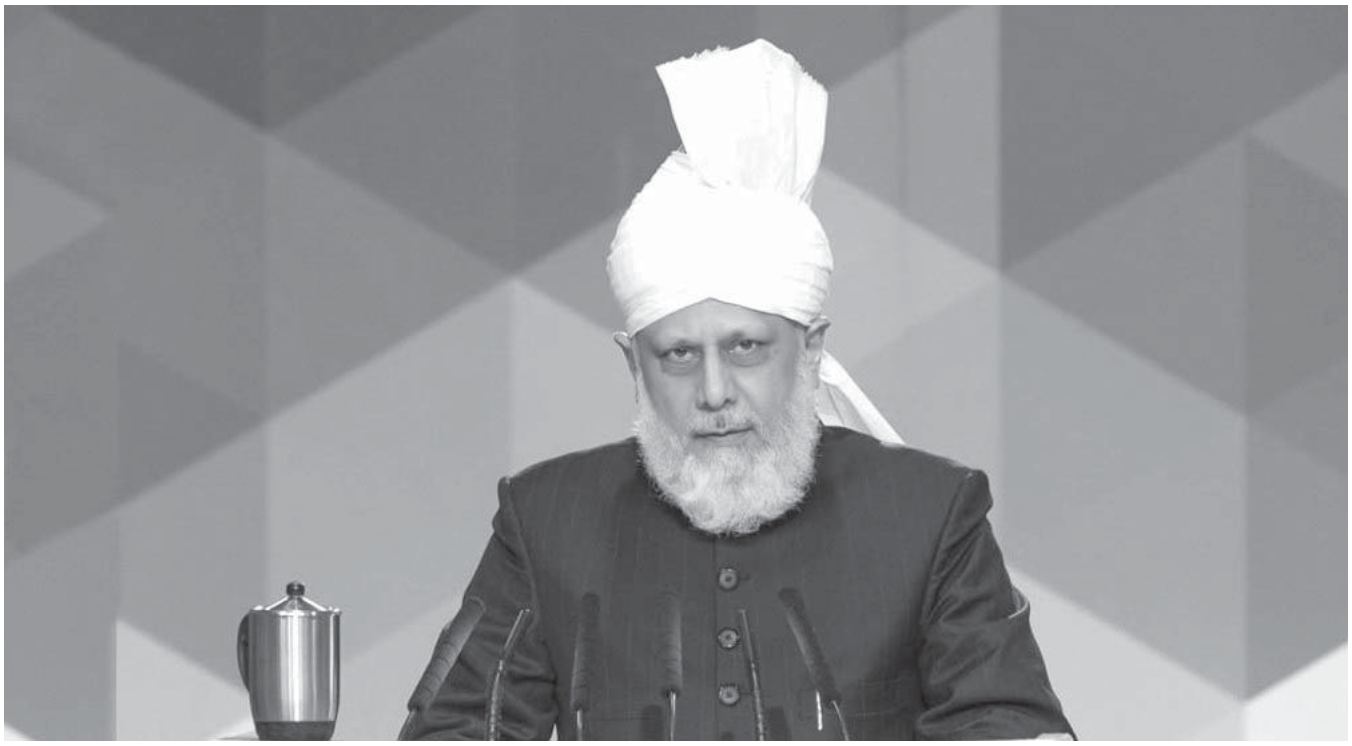

ইসলাম আহমদীয়াত আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতিলাভের সোপান

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মোতাবেক ১০ তবলীগ ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

পৃথিবীতে প্রায়শঃ দেখা যায় যে, বস্তুবাদিতার মাঝে মানুষ ক্রমশঃই নিমজ্জিত হচ্ছে। জাগতিক উপায় উপকরণ হস্তগত করার জন্য সবাই মরিয়া হয়ে উঠছে। মানুষ অসুস্থ এক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আল্লাহ্ তা'লা এবং ধর্মকে গৌণ বিষয় মনে করা হয়, বরং দুনিয়াদার তথা পার্থিবতায় আসক্ত এমন মানুষও রয়েছে, যারা খোদার সত্তাকেই অস্বীকার করে বসে আছে, আর এদের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। ধর্মকে নাঊযুবিল্লাহ্ এরা এক বাজে ও বৃথা বিষয় জ্ঞান করে।

কিন্তু এমন যুগে এবং এমন পরিস্থিতিতেও এমনও মানুষ আছে, যারা খোদার সন্ধানে রত এবং খোদার পানে নিয়ে যায় এমন ধর্মানুসন্ধানী। আর যারা খোদার সাথে সুসম্পর্কের বন্ধন রচনা করতে চায়, সত্যিকার মাযহাব বা ধর্মকে যারা সনাক্ত করতে চায়, সত্যধর্ম সন্ধান করে সেই ধর্মে যারা যোগ দিতে চায়, এই উদ্দেশ্যে তারা দোয়া করে, উৎকণ্ঠিত হয়, ছটফট করতে থাকে। আর নিশ্চয়ই এক নেক বান্দা যখন এক বিশেষ বেদনার সাথে এই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে, তখন খোদা তা'লাও এমন মানুষকে পথের দিশা দেন, তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের আন্তরিক প্রশান্তি এবং সত্যিকার ধর্ম বুঝার ব্যবস্থা করেন, তাদের ঈমান এবং বিশ্বাসে দৃঢ়তা দান করে একে সমৃদ্ধ করেন।

এ যুগে খোদার নৈকট্য লাভ করা এবং তাঁর ধর্মকে বুঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর পদমর্যাদা দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর বিশ্ববাসীকে বলেছেন, নিজেদের উৎকণ্ঠা দূর করতে আর সত্যিকারের মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত কর।

এ যুগে খোদার নৈকট্য লাভ করা এবং তাঁর ধর্মকে বুঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর পদমর্যাদা দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর বিশ্ববাসীকে বলেছেন, নিজেদের উৎকণ্ঠা দূর করতে আর সত্যিকারের মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত কর। খোদার নৈকট্যের পথ অবলম্বন কর, ইবাদতের প্রকৃত মর্ম এবং তত্ত্ব বুঝ আর দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্য অবলোকন কর। যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্নভাবে ব্যাকুল হৃদয়ের লোকদেরকে সত্যের পানে পরিচালিত করেন এবং তাদের ঈমান দৃঢ়তর করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অতীত এবং বর্তমান এমনসব ঘটনায় পরিপূর্ণ। আর প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, পৃথিবীর কোন না কোন গ্রাম, শহর এবং দেশে এমন ঘটনাবলী ঘটেই চলছে, যা কেবল মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে নতুন যোগ দেয়া হেদায়াতপ্রাপ্তদের ঈমান দৃঢ় করার কারণই হচ্ছে না বরং পুরোনো এবং জন্মগত আহমদীদের ঈমানকেও তা মজবুত এবং দৃঢ় করে আর তাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণও হয়ে থাকে। এখন আমি এমন কয়েকটি ঘটনা এবং মানুষের এমন কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, যা থেকে প্রতিভাত হবে যে, কীভাবে খোদা তা'লা স্বীয় অনুগ্রহে মানুষের হেদায়াত লাভের বিধান এবং ব্যবস্থায় পরিপূর্ণতা দান করে থাকেন।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। নেয়ামিনা স্টেট জেলার এক গ্রামের এক ভদ্রমহিলা সিস্টার কানিফার্টি, যার বয়স ৬৫ বছর। গত ১০ বছর ধরে তিনি এক ধরণের পায়ের রোগে আক্রান্ত ছিলেন আর কোনভাবেই তা সারছিল না। এই কষ্টের কারণে তার চলাফেরার সামর্থ্যও ছিল না। চিকিৎসার জন্য তিনি তার গ্রাম থেকে দূরে বানসান অঞ্চলে যান, যেখানে দৈবক্রমে এম.টি.এ.-তে আমার খুতবা শোনার সুযোগ হয়। সেই ভদ্রমহিলা যখন নিজের গ্রামে ফিরে আসেন, তখন স্বপ্নে তাকে বলা হয় যে, তুমি টেলিভিশনে যাকে দেখেছ, তাঁর অনুসরণ কর। কেননা, তিনি তোমাকে সঠিক এবং মুক্তির পথ বলে দিচ্ছেন। এই স্বপ্ন দেখার পর সেই ভদ্রমহিলা বয়আত করেন। আমীর সাহেব লিখেন, ভদ্রমহিলা নিজেই বর্ণনা করেছেন, বয়আত করা মাত্রই তার পায়ের কষ্ট ক্রমশঃ লাঘব হতে শুরু করে আর এ কারণে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এখন পুরো গ্রামে তিনি তবলীগ করেন। তিনি মানুষকে বলেন, আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হওয়ার কল্যাণে কীভাবে তার কষ্ট লাঘব হয়েছে।

পুণ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা যাকে রক্ষা করতে চান বা যার পুণ্য তিনি পছন্দ করেন, এমন লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বিস্ময়করভাবে হেদায়াত দেয়ার ব্যবস্থা করেন। দুনিয়ার এক কীট বা বস্তুবাদি মানুষ হয়তো বলতে পারে যে, সে গ্রামে বসবাসকারী এক অজ্ঞ এবং নিরক্ষর মহিলা ছিল, এটি তার একটি অলীক ধারণা মাত্র। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যাকে ঈমানের সম্পদে সম্পদশালী করেন, ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ় করেন, সে এমন জাগতিকতার পূজারীদেরকেই অজ্ঞ মনে করে।

অনুরূপভাবে, বুরকিনাফাঁসো পশ্চিম আফ্রিকার ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী একটি দেশ,সাহারা মরুভূমির পাশে অবস্থিত, বরং সেদেশের কিছু অংশ মরুভূমিও। এমন সুদূরের দেশে বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কীভাবে পথ প্রদর্শন করেছেন দেখুন! দেশটি শুধুই দূরে অবস্থিত নয়, বরং সে দেশেরও একটি ছোট গ্রামে বসবাসকরী এ ব্যক্তি সম্পর্কে মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, লিও অঞ্চলের একটি জামা'তের এক বন্ধু সোওয়াদোগু সাহেব জলসা সালানা জার্মানির পর বয়আত করেন। তিনি বলেন, নিয়মিত তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের রেডিও শুনতেন আর জামা'তের কোন প্রতিনিধির দল তবলীগের জন্য তার গ্রামে এলে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হওয়ার সুবাদে তিনি বলেন, আমি তাদের দেখাশোনা করতাম আর তবলীগের ব্যবস্থাও করতাম। আহমদী ছিলেন না, কিন্তু আহমদীদের প্রতি তিনি সহানুভূতি রাখতেন। স্বল্পকাল পর মৌলভীরা একথা জানতে পারে।

তিনি বলেন, মৌলভীরা আমার কাছে ছুটে আসে আর বলা আরম্ভ করে যে, তুমি আদৌ আহমদীয়া রেডিও শুনবে না আর আহমদীদের সাথে মেলামেশাও করবে না। কেননা, এরা তোমার ইসলামকে নষ্ট করবে। তিনি বলেন, মৌলভীর প্ররোচণায় আমি আহমদীদের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করি আর আহমদীয়া রেডিও

শোনাও বন্ধ করে দেই। স্বল্পকাল পর দৈবক্রমে যা ঘটে তা হল, এক সফর থেকে ফিরে আসছিলাম, নামায পড়ার জন্য আমি একটি মসজিদে যাই,এই মসজিদটি ছিল ছোট্ট একটি গ্রামে। নামায আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি ওজু করা আরম্ভ করি, তখন অপর এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেন এবং বলেন, এটি আহমদীদের গ্রাম আর মসজিদও আহমদীদেরই। এটি শুনতেই আমি ভাবলাম যে, কোথায় ফেঁসে গেলাম? আমি তো দীর্ঘকাল থেকে এদেরকে এড়িয়ে চলছি। এরপর ধীরে ধীরে ওজু করতে থাকি, যেন নামায শেষ হলে পরে পৃথকভাবে একাই নামায পড়তে পারি। (যাহোক, সেখানেই তাকে নামায পড়তে হয়েছে। তার কোন নেকী খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় হবে, যার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে আমাদের মসজিদে নামায পড়তে হয়েছিল।) সে রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, অনেক বড় একটি জন-সমাগম। আমি সেই ভিড় ঠেলে সম্মুখে গিয়ে দেখি, এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান আর সহস্র সহস্র মানুষের জনসমুদ্র তার চতুষ্পার্শ্বে। আমি কাউকে জিজ্ঞেস করি, ইনি কে যার চতুষ্পার্শ্বে মানুষ এভাবে সমবেত হয়ে আছে? তখন এক ব্যক্তি উত্তর দেয়, ইনি সেই ব্যক্তি, যার কথা তোমার শোনা উচিত, কিন্তু মৌলভীরা তোমাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে।

তিনি বলেন, তখন আমার চোখ খুলে যায়। আমার হৃদয়ে এই স্বপ্নের এমন গভীর প্রভাব ছিল যে, পুনরায় আহমদীদের সাথে যোগাযোগ বহাল করি। এরপর একদিন আমি মিশন হাউসে ফোন করে মুরব্বী সাহেবকে বলি যে, আমি বয়আত করতে চাই। মুরব্বী সাহেব বলেন, আপনি অমুক দিন আমাদের মিশন হউসে চলে আসুন। নির্ধারিত দিনে আমি মিশন হাউসে গিয়ে দেখি সেখানে সবাই টেলিভিশনে কিছু দেখছে। আমিও টিভি দেখার জন্য সামনে এগিয়ে যাই আর টিভির দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। কেননা, টেলিভিশনে সেই দৃশ্যই প্রদর্শিত হচ্ছিল যা আমি স্বপ্নে দেখেছি। জিজ্ঞেস করার পর মুরব্বী সাহেব বলেন, এটি জলসা সালানার সমাপনী অধিবেশন আর আমাদের খলীফা বক্তৃতা করছেন। আমি তখন মুরব্বী সাহেবকে বললাম, এখনই আমার বয়আত নিন। খোদা তা'লার কসম, এই দৃশ্য এবং এই ব্যক্তিকেই আমি স্বপ্নে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে তিনি এখন তার পরিবার-পরিজনসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন আর গ্রামের অন্যান্য লোকদেরকেও তবলীগ করছেন।

এভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তি অতিবাহিত হয় এবং খোদা তা'লার পথ-নির্দেশনা লাভ করে, নিশ্চিতভাবে ঈমানের ক্ষেত্রে সে ক্রমশঃ দৃঢ়তা অর্জন করতে থাকে। অনেকেই আমাকে চিঠি লিখে যে, আমরা যেভাবে খোদার পক্ষ থেকে আশ্বস্ত হয়ে আর নিদর্শন দেখে বয়আত করেছি এবং আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছি, এখন কেউ আমাদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে দোদুল্যমান করতে পারবে না। অন্য কোন যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন এখন আর আমাদের নেই। অনেকেই বিরোধিতায় এতটা হঠকারিতা প্রদর্শন করে যে, যুক্তিপূর্ণ কথাও শুনতে চায় না। কিন্তু এমন মানুষও আছে, যাদের মাঝে অহংকার নেই আর যাদের মাঝে মানবতাও অনেকটা রয়েছে। তাই এমন মানুষ, যাদের মাঝে অহংকার নেই এবং মানবতাবোধ রয়েছে, খোদা তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন। আর এই পথ-নির্দেশনা কাজে লাগালে তারা খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে সিরিয়ার এক ব্যক্তির সাথে। প্রথমে সে ছিল চরম বিরোধী। কিন্তু সত্য লাভের জন্য এরপর খোদার পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা লাভে বাসনা সৃষ্টি হয়, বরং এ দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় আর খোদার পক্ষ থেকে তিনি পথ-নির্দেশনাও লাভ করেন।

সিরিয়ার অধিবাসী আহমদ সাহেব বলেন, আহমদীদের সাথে আমার পূর্ব থেকেই সম্পর্ক ছিল আর উঠা-বসাও ছিল। বাইরে তাদের সাথে দেখা হতো, তারাও আমার ঘরে আসত। তাদের অনেক কথা আমার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য মনে হতো আর আমি মানতামও। কিন্তু সেসব কথা মানা সত্ত্বেও ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি আমার জন্য অগ্রহণযোগ্য ছিল। এর কারণ হল, আমি সুদীর্ঘকাল ধরে আকাশ থেকে ঈসার অবতরণের অপেক্ষায় ছিলাম। ঈসার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে 'বাইতুল মুকাদ্দাস'কে স্বাধীন করানোর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল আমার। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা শুনে আমার কল্পিত জিহাদের সব স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আকাশ থেকে মসীহ্ না এলে জিহাদ করব কীভাবে? তিনি বলেন, একদিন আমার ঘরে কতক আহমদী-বন্ধু বসেছিলেন, তাদের মাঝে মো'তাযেল কাযাক সাহেবও ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হলে আমি বলি, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি, আজকের পর ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে আমার সাথে বা আমার ঘরে কথা বলবে না। তখন কাযাক সাহেব বলেন, আপনার কাছে আমারও একটি অনুরোধ হল, এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনার জন্য আপনি খোদার কাছে দোয়া করুন। তিনি বলেন, তার এ কথা আমার খুব পছন্দ হয়। আমি সেই সন্ধ্যা থেকেই খোদা তা'লার দরবারে সেজদায় কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে আরম্ভ করি। রাতে ঘুমানোর পর স্বপ্নে দেখি, আমি উঁচু কোন স্থানের দিকে যাচ্ছি। পথিমধ্যে এক নরম ভূমিখণ্ড আসে, যাতে পা রাখতেই এমন মনে হয় যে, এটি আমাকে গভীর কোন খাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন এক ব্যক্তি আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরে আমাকে বের করে আনেন এবং বলেন, আবু আসম (এটি তার উপাধী)! তিনি বলেন, এখানে আর আদৌ আসবে না। আর নিশ্চিত জেনো যে, ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। যাও, তুমি এখন নিজ পথে অগ্রসর হও। আমি জাগ্রত হয়ে আমার আহমদী ভাইকে ফোন করে বলি, আমি মো'তাযেল কাযাক সাহেবের কাছে যাব। এরপর আমরা দু'জন মো'তাযেল

একদিকে উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী মানুষ রয়েছে যারা ধর্মকে ভুলে গিয়ে জাগতিক উপায় উপকরণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অপর দিকে সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আফ্রিকার কোন অঞ্চলের এক ব্যক্তি, যার গ্রাম পর্যন্ত পাকা রাস্তাও হয়তো যায় নি, যারা জাগতিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, কিন্তু হৃদয়ে এক বেদনা বিরাজমান। আর সেই উৎকণ্ঠাও ব্যাকুলতা নিয়ে খোদার কাছে এই দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্! ইসলামী শিক্ষা এখান থেকে হারিয়ে গেছে।

সাহেবের বাড়ি পৌঁছাই এবং তার ঘরে প্রবেশ করতেই আমি দেয়ালে ঝুলানো একটি ছবি দেখে হতভম্ব হয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি যে, এটি কার ছবি? তারা বলেন, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর ছবি। এটি শুনেই আমি বলি, আমি এখনই বয়আত করতে চাই। কেননা, কক্ষের দেয়ালে ঝুলন্ত এই ছবি সেই ব্যক্তির, যিনি স্বপ্নে আমাকে কাঁধ ধরে চোরাবালি সদৃশ ভূমি থেকে বের করে আনেন এবং বলেন, ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন।

যেভাবে আমি বলেছি, খোদা তা'লা বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন মাধ্যমে ধর্ম বুঝার এবং সত্য পাওয়ার পথ খুলে দেন, কখনো স্বপ্নের মাধ্যমে আর কখনো তবলীগের মাধ্যমে, আবার কখনো জামা'তে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা-সংক্রান্ত কোন বই বা সাহিত্য পড়ে কেউ হিদায়াত পাচ্ছে আর কখনো কোন আহমদীর উত্তম চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে কেউ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করছে। আজকাল অনেকেই আছে, যারা এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে সত্যিকার ইসলামের বার্তা পেয়ে আহমদীয়াতভুক্ত হয়ে থাকে।

বেনীনের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, এক অঞ্চলের চীফ, যিনি মুশরিক বা বহু-ঈশ্বরবাদী ছিলেন। তবলীগ করার পর তিনি আহমদী হয়ে প্রকৃত ইসলাম অনুসরণ করা আরম্ভ করেন। যে হৃদয় শিরকের কেন্দ্রস্থল ছিল, তা এক-অদ্বিতীয় খোদার সামনে সিজদাকারী হয়ে গেছে। শুধু এতটাই নয়, বরং তিনি সেই অঞ্চলের মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামের তবলীগকারীর ভূমিকা পালন করেন। তার এলাকায় একটি মসজিদের উদ্বোধন করার সময় তিনি যে বক্তৃতা করেছেন, তার একটি অংশ তার ভাষ্যে আমি তুলে ধরছি। তিনি বলেন, অর্থাৎ–সেই পৌত্তলিক চীফ, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি বলেন, আমি জানি না অ-আহমদীরা কেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধিতা করে। আজকে জামা'তে আহমদীয়াই পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বাণী প্রচার করছে। এক বছর পূর্বেও আমি মুশরিক ছিলাম, বরং মুশরিকদের রাজা ছিলাম। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুবাল্লিগ আমার চিন্তাধারা পাল্টে দিয়েছেন। তিনি ইসলামের সত্যিকার চেহারা আমাকে দেখিয়েছেন, তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যদি খ্রিষ্টান এবং পৌত্তলিকদেরকে ইসলামভুক্ত করে, তাহলে তোমাদের সমস্যাটা কী? তিনি বলেন, এই মসজিদ সবার জন্য উন্মুক্ত। খোদার ইবাদতের জন্য এক খ্রিষ্টানও যদি এই মসজিদে আসে, তাকে বাধা দেয়া হবে না। তোমরা বিরোধিতা পরিত্যাগ কর আর একবার ভিতরে এসে দেখ, এখানে একান্ত ভালোবাসা, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষাই দেখবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কেবল পৃথিবীর মঙ্গল চায়। তিনি আরো বলেন, আমার মন চায়, এখানে মসজিদের পাশে নিজের একটি ঘর নির্মাণ করি আর প্রত্যেক আগত ব্যক্তিকে বলি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই সত্যিকার ইসলাম।

একদিকে সেইসব নেতা এবং আলেমরা রয়েছে, যারা ইসলামের নামে ফিতনা এবং নৈরাজ্য ছড়াচ্ছে আর অহংকারে এদের পা মাটিতে পড়ে না। নিজ অহং-এর কারণে মুসলমানের হাতে মুসলমানকে হত্যা করাচ্ছে। অপরদিকে কোন মুশরিকের কোন নেককর্ম খোদার পছন্দ হওয়ায় অথবা খোদা শুধুই কৃপাবশতঃ ইসলামী-শিক্ষা অনুসরণের দাবিদারদের জন্য প্রকৃত ইসলামী-শিক্ষা তুলে ধরা এবং ফিত্না ও নৈরাজ্য এড়ানো-সংক্রান্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য তাকে দণ্ডায়মান করেন। এই হল খোদা তা'লার ব্যবহার ও তাঁর আচরণ। মানুষ যদি বিনয়ী হয়, তাহলে এভাবে খোদা তা'লা কৃপা করেন। কিন্তু কেউ যদি অহংকারে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে সে যতই নামায পড়ুক বা দোয়া করুক অথবা নিজেকে নেক মনে করুক বা হাজী হোক না কেন, এমন মানুষ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হেদায়াত পায় না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে মানুষ যখন বয়আত করে আর প্রকৃত ইসলামের স্বাদ পায়, তখন তাদের জীবনাচরণে কী পরিবর্তন আসে, কীভাবে খোদা তাদেরকে পথের দিশা দেন, কীভাবে তারা কুরবানীর ক্ষেত্রে

বাহ্যত অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অনেক সংগঠন আর অনেক এমন দল রয়েছে, যারা ইসলামের নামে কাজ করছে, তবলীগি জামা'তও রয়েছে। কিন্তু প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থের পিছনে ছুটছে, বিরোধিতায় পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া জারী করার জন্য এরা সব সময় প্রস্তুত। এরা ইসলামের কী সেবা করবে? ইসলামের বাণী পৌঁছানোর এই দায়িত্ব আজ মুহাম্মদী মসীহ্‌র দাসদের উপরই ন্যস্ত।

প্রতিযোগিতামূলক ভূমিকা রাখেন, এ-সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে আমাদের এক মুবাল্লিগ লিখেন, ক্যামেরুন সফরকালে একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। সেই সৈন্যের সম্পর্ক ব্যামোন গোত্রের সাথে, যেখানকার সুলতান অর্থাৎ, স্থানীয় বাদশাহ দু'বছর পূর্বে (এটি দুই বছর পূর্বের ঘটনা) যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করেন। এবার যখন ক্যামেরুন সফরে যাই, সেই ব্যক্তির সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, মসজিদের জন্য তিনি জামা'তকে একটি প্লট বা এক খণ্ড জমি দিতে চান। আমি এবং সেই জামা'তের প্রেসিডেন্ট সেই প্লট দেখতে গিয়ে দেখি যে, তিনি সেখানে পূর্বেই একটি বেইজমেন্ট বানিয়ে রেখেছেন। নির্মাণকাজ পূর্ব থেকেই চলছিল, বেইজমেন্ট প্রস্তুত ছিল আর বেইজমেন্টের উপর তিনি ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন, আমি তাকে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্ন-মাঝে তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি এখানে নিজের ঘর নয় বরং মসজিদ নির্মাণ কর'। তিনি (সেই অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য) আরো বলেন, এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেই প্লট এবং বিল্ডিং যা নির্মাণ করা আরম্ভ করেছি, তা জামা'তের নামে লিখে দিব, যেন জামা'ত এখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারে। এটি অনেক বড় একটি জমি, এক হাজার বর্গমিটার জায়গা জুড়ে এটি অবস্থিত। জামা'তের হাতে তিনি দলিলপত্র তুলে দেন। ইনশাআল্লাহ্‌ সেখানে মসজিদও নির্মিত হবে।

আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করছি, কীভাবে ইসলাম-দরদী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী এক ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ্‌ তা'লা গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক আহমদী মুবাল্লিগকে তার কাছে পাঠান। এটি বর্ণনা করতে গিয়ে আইভোরিকোস্টের মুয়াল্লিম সাহেব লিখেন, আইভোরিকোস্টের আবিনগুরো অঞ্চলের পল্লী এলাকার একটি গ্রাম ইয়াডুকোরো থেকে সাইদু সাহেব বর্ণনা করেন, সেই গ্রামে তার দাদার মাধ্যমে ইসলাম আসে, কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে চলে যায়। ইসলাম নামেমাত্র অবশিষ্ট থাকে, যেমনটি আজ সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা। সাইদু সাহেব বলেন, আমি প্রায়শঃ দোয়া করতাম যে, হে আল্লাহ্‌! এমন কোন ব্যবস্থা করুন, যেন গ্রামের মানুষ ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষা অনুসরণের তৌফিক লাভ করে। ২০১৬ সালের রমযানের প্রারম্ভে এক রাতে দোয়া করতে করতে আমার চোখে পানি চলে আসে, গভীর বেদনার সাথে আমি দোয়া করি। এর দু'এক দিন পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুবাল্লিগ আমাদের গ্রামে আসেন আর জামা'তের পরিচিতি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এই কথা আমার জন্য খুবই ঈমান-উদ্দীপক ছিল যে, আমাদের দূর-দূরান্তের এই গ্রামে কোন মুবাল্লিগ এভাবে ইসলামের পুনর্জীবনের বার্তা নিয়ে আসবেন। জামা'তের মুবাল্লিগের এই সফরকালে গ্রামের ৫৫ ব্যক্তি ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করে। সাইদু সাহেব বলেন, এভাবে জামা'তের কল্যাণে আজকে আমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা অনুসরণ করছি।

একটু চিন্তা করুন, একদিকে উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী মানুষ রয়েছে যারা ধর্মকে ভুলে গিয়ে জাগতিক উপায় উপকরণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অপর দিকে সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আফ্রিকার কোন অঞ্চলের এক ব্যক্তি, যার গ্রাম পর্যন্ত পাকা রাস্তাও হয়তো যায় নি, যারা জাগতিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, কিন্তু হৃদয়ে এক বেদনা বিরাজমান। আর সেই উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা নিয়ে খোদার কাছে এই দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্‌! ইসলামী-শিক্ষা এখান থেকে হারিয়ে গেছে। হে আল্লাহ্‌! কাউকে পাঠাও, যে আমাদেরকে ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষার উপর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবে এবং এ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করবে। আর খোদার বিশেষ নিয়তি এবং খোদার সিদ্ধান্ত অনুসারে মুহাম্মদী মসীহ্‌র এক দাস সেই গ্রামে যান এবং তাদেরকে ইসলামী-শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেন। কেননা, আজ জগদ্বাসীকে যদি কেউ প্রকৃত ইসলাম শিখাতে পারে, তাহলে তা কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই সম্ভব, যে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে আর তাঁর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা চিনেছে এবং বুঝেছে।

অতএব, আমাদের সবার দায়িত্ব হবে, এক বেদনা নিয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীতে প্রচার, প্রসার এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দোয়া করা আর চেষ্টাও করা। বাহ্যত অনেক

প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অনেক সংগঠন আর অনেক এমন দল রয়েছে, যারা ইসলামের নামে কাজ করছে, তবলীগি জামা'তও রয়েছে। কিন্তু প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থের পিছনে ছুটছে, বিরোধিতায় পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া জারী করার জন্য এরা সব সময় প্রস্তুত। এরা ইসলামের কী সেবা করবে? ইসলামের বাণী পৌঁছানোর এই দায়িত্ব আজ মুহাম্মদী মসীহ্‌র দাসদের উপরই ন্যস্ত। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাদের কাজ সহজসাধ্য করে দিয়েছেন, কাউকে স্বপ্নের মাধ্যমে পথের দিশা দিচ্ছেন, কাউকে অন্য কোনভাবে। অতএব, যদি বয়আতের দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হয়, তাহলে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

বয়আতের পর আমাদের কেমন হওয়া উচিত, কী করা উচিত, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "প্রথাগত বয়আত কোন কাজের নয়, এমন বয়আত থেকে লাভবান হওয়া কঠিন।" (অর্থাৎ, সেইসব বিষয় এবং সেইসব কল্যাণের ভাগী হওয়া, যা মসীহ্ মওউদের সাথে সম্পৃক্ত)। তিনি বলেন, "এটি থেকে কেউ তখনই লাভবান হবে, যখন সে নিজ সত্তাকে ভুলে গিয়ে পূর্ণ ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁর (সা.) সঙ্গী হবে। মহানবী (সা.)-এর সাথে প্রকৃত এবং সত্যিকার সম্পর্ক না থাকার কারণে মুনাফেকরা ঈমানহীন থেকে গেছে। সত্যিকার ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় নি, তাই মৌখিক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা তাদের কোন কাজে আসে নি। এই সম্পর্ক দৃঢ় করা আবশ্যক।" তিনি (আ.) বলেন, "...ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক দৃঢ় করা উচিত। বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও আর জীবনাচার পালনের ক্ষেত্রেও যথাসাধ্য সেই মানুষ অর্থাৎ, মুরশিদের রঙে রঙিন হওয়া চাই।" (যাকে মেনেছ, নিজেকেও তার মত বানানোর চেষ্টা করা উচিত।) তিনি (আ.) বলেন, "...জীবনের কোন ভরসা নেই। তাই কালক্ষেপণ না করে সততা এবং ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট এবং আসক্ত হওয়া উচিত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণ (কীভাবে আমি জীবন অতিবাহিত করছি) করা উচিত"। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মূদ্রিত)

নবাগতদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা ঈমান এবং বিশ্বাসে দৃঢ়তা দান করুন। বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে তারা যেন উন্নতি করে। ঈমানের যে স্ফুলিঙ্গ খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করেছেন, আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলাম গ্রহণের পর তারা যেন সেই ক্ষেত্রে আরো উন্নতি করে। শয়তান যেন তাদেরকে কখনো পথভ্রষ্ট বা প্ররোচিত করতে না পারে। ঈমানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দৃঢ়তা দান করুন। আমরা, যারা পুরোনো এবং জন্মগত আহমদী, আমাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে ঈমান বৃদ্ধি এবং সবসময় ঈমানে উজ্জ্বলতা সৃষ্টির তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এতদ্‌সম্পর্কে দৃঢ়তা দান করুন, আমরা যেন কখনো নবাগত কোন আহমদীর পদস্খলনের কারণ না হই আর আমরা জগদ্বাসীকে যেন সব সময় সঠিক পথ দেখাতে পারি। এই কথা ভেবে আনন্দিত হবেন না যে আমরা পুরোনো আহমদী, বরং বয়আতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন। জাগতিক চাকচিক্য যেন আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না হয়, বরং খোদার সন্তুষ্টি যেন আমাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হয়। অচিরেই আমরা যেন প্রকৃত ইসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই আর জগদ্বাসীকে যেন বলতে পারি, যে বিষয়কে তোমরা জগতের জন্য ক্ষতিকর মনে কর, সত্যিকার অর্থে সেটিই তোমাদের জন্য এবং পৃথিবীর জন্য মুক্তির সনদ।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩-৯ মার্চ ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৯, পৃ. ৫-৭)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(১৭তম কিস্তি)

যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি সহজেই দেখতে পাবেন যে, এই সকল সমস্যা-সংকুল অবস্থার একমাত্র সমাধান হচ্ছে পুরুষকে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দান করা। এটা এজন্য বলা হচ্ছে না যে, এতে করে তাদের জৈবিক তাড়না মিটবে, বরং এটা এজন্যই বলা হচ্ছে যে, এতে করে বিপুল সংখ্যক স্ত্রীলোকের মৌরিক চাহিদাগুলোকে মেটানো সম্ভব হবে। এটাই যৌক্তিক এবং এটাই বাস্তব সমাধান। এই সমাধানকে যদি প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে সমাজের জন্য যে একমাত্র বিকল্প থাকবে, তা হচ্ছে একটা অপরাধক্লিষ্ট, বাঁধনহারা সমাজের অতলে দ্রুত নিপতিত হওয়া। হায়! এটাই বুঝি আজ বেছে নিয়েছে পাশ্চত্য জগৎ! আপনি যদি এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গীকে অধিকতর বাস্তবতার নিরিখে এবং আবেগমুক্ত মন নিয়ে আবারও পরীক্ষা করে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, প্রশ্নটা আসলে নারী ও পুরুষের সম-অধিকারের নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে দায়িত্বশীলতা এবং দায়িত্বহীনতার মধ্যে যে কোন একটাকে বাছাই করে নেওয়ার। ইসলাম পুরুষকে একই সঙ্গে একাধিক বিয়ে করবার অনুমতি দেয় শুধু এই শর্তে যে, পুরুষরা সেই কঠিন ও সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি সামলানোর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে পূর্ণরূপে দায়িত্বাবলী পালনের মাধ্যমে এবং তারা তাদের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমতা বজায় রেখে চলবে এবং তাদের প্রতি যথার্থ সুবিচার করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা এতীমদের ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তাহলে তোমরা অন্য নারীদের মধ্য থেকে (যারা এতীম নয়) তোমাদের পছন্দমত দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিয়ে কর। তবে তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না (এবং সমান সুবিচার করতে পারবে না), তাহলে (মাত্র) একজনকে অথবা তোমাদের ডানহাতের অধিকারভুক্তগণকে বিয়ে কর। এটাই নিকটবর্তী উত্তম ব্যবস্থা, যাতে তোমরা অবিচার না কর"। (সূরা নান্ নিসা-৪:৪)

এর বিকল্প যা, তার চেহারা অনেক বেশী কুৎসিৎ না হয়েই পারে না। একটা সমাজে যদি অধিক সংখ্যায় অবিবাহিতা নারী থাকে, তাহলে তো তাদেরকে পরপুরুষ আকৃষ্ট বা প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করার জন্য দোষ দেয়া যাবে না, বিশেষতঃ সেই সমাজটা যদি ধর্মকর্ম পালনে তেমন নিষ্ঠাবান না হয়। আর যাই হোক, নারীরাও তো মানুষ। তাদেরও তো আবেগ-অনুভূতি আছে, আছে অতৃপ্ত কামনা-বাসনা। যুদ্ধজনিত মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের কারণে যখন মন একজন সঙ্গীর জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, যখন বিয়ে শাদীর বা ঘর বাঁধার কোন নিশ্চয়তা থাকে না, যখন কোন জীবনসাথী থাকে না, সন্তানদের কোন আশা ভরসা থাকে না, তখন তো সেই জীবন শূন্যতায় ভরে ওঠে; তখন তো সেই জীবনে ভবিষ্যতের আকাশ খাঁ খাঁ করতে থাকে, এবং তা ধূসর ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় নারীকে যদি বৈধ উপায়ে জায়গা করে দেওয়া না হয় এবং তাকে আপসে আদান-প্রদানের নীতির ভিত্তিতে খাপ খাইয়ে নেওয়া না হয়, তাহলে তো সামজে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে বাধ্য। নারীরা তখন যে করেই হোক অবৈধ উপায়ে অন্যান্য স্বামীদের ওপরে ভাগ বসাবে। এবং তার পরিণতি ন্যাক্কারজনক না হয়ে যায় না। আনুগত্য বিভক্ত হয়ে পড়বে। সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা নষ্ট হয়ে যাবে। ঘরের শান্তির ভিত্তিতে ফাটল ধরবে। অবিশ্বস্ত স্বামীরা মনে অপরাধবোধ নিয়ে বসবাস করতে থাকবে, ফলে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বৃদ্ধি পাবে এবং অপরাধ করার প্রাতি তারা আরও বেশী করে ধাবিত হবে। এই অবস্থার প্রধান শিকারে পরিণত হবে আনুগত্যে মহৎ আদর্শ। রোমান্স তার বিমল আনন্দ হারাবে এবং তা ইতরামির স্তরে নেমে গিয়ে ক্ষণিকের মোহে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমানাধিকারের কথা যারা বলেন, তাঁরা ভুলে যান যে, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে নারী-পুরুষের কার্যাবলী ভিন্ন এবং সেজন্য তাদের দৈহিক গঠনও ভিন্ন। কাজেই ভিন্নতার এই কারণে সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকারের প্রশ্নটা অবাস্তব।

শুধু নারীরাই পারে সন্তানের জন্ম দিতে। তারাই কেবল ন' মাসের অধিক কাল ধরে ভবিষ্যতের মানব-প্রজন্মের বীজের পরিচর্যা করতে পারে। নারীরাই তাদের বাচ্চাদেরকে অন্ততঃ বাচ্চাদের শৈশবকালে লালন পালন করতে পারে, যা কিনা পুরুষরা পারে না। সন্তানের সঙ্গে দীর্ঘদিনে রক্ত-সম্পর্কে কারণে সন্তানের ওপর পুরুষের চাইতে নারীর মনস্তাত্ত্বিক বন্ধন ও প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে। নারী ও পুরুষের দৈহিক গঠন সংক্রান্ত এই পার্থক্যকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যদি উপেক্ষা করা হয়, এবং তদনুযায়ী সমাজে উভয়ের ভূমিকার পার্থক্যকেও উপেক্ষা করা হয়, তাহলে আর্থ-সামাজিক সেই ব্যবস্থা সমাজে সুস্থ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল

হয় না। প্রধানতঃ, নারী ও পুরুষের মধ্যকার গঠন সংক্রান্ত এই পার্থক্যের কারণেই ইসলাম উভয়ের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ভূমিকা পালনের কথা বলে।

নারীদেরকে অবশ্যই পরিবারের জন্য উপার্জনের দায়িত্ব থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখতে হবে। এই দায়িত্ব তো নীতিগতভাবে পুরুষদের ওপরই বর্তায়। তবু নারীদেরকেই বা কেন সংসারের আর্থিক বোঝা টানার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে বাধা দেওয়া হবে। চাইলে তারাও তা করতে পারবে। তবে, সেজন্য তারা তাদের সন্তান জন্ম দেওয়া এবং পরিবারের সেবাযত্ন করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়িত্বাবলী পালনে অবহেলা করতে পারবে না। কেননা, এগুলোই হচ্ছে নারীদের প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব। এগুলোই আগে পালন করতে হবে এবং এটাই হচ্ছে ইসলামের কথা।

তাছাড়া, নারীদের গঠন তুলনামুলকভাবে দুর্বল ও হাল্কা। তবু বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহ্ তাদের দেহে বরদাস্ত করার অধিকতর ক্ষমতা দান করেছেন। এই ক্ষমতার পিছনে কারণ হচ্ছে, তাদের জীবকোষে (Cell) একটা অতিরিক্ত অর্ধক্রমো জোমের (Half-Chromosome) বিদ্যমানতা, যার দরুন নারী ও পরুষের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। এই ক্ষমতা তাদেরকে দান করা হয়েছে স্পষ্টতঃই, সেই অতিরিক্ত বোঝা বহনের জন্য, যা তাদের ওপর চাপানো হয় তাদের গর্ভধারণ, সন্তান-প্রসব এবং স্তন্য-দানকালীন সময়ে। অবশ্য, এই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু নারীকে বাহ্যতঃ অধিকতর মজবুত ও শক্তিশালী দেখায় না। সমানাধিকারের নামে তাদেরকে শুধু শুধু বা অন্য কোন নামে উৎপদনের ক্ষেত্রে কঠিন সব দৈহিক কাজে নিয়োজিত করা ঠিক হবে না। তাদের প্রতি অধিকতর নমনীয় হতে হবে, দয়া-মায়া প্রদর্শন করতে হবে। ঘরের দৈনন্দিন কাজে নারীদের ওপরে হাল্কা বোঝা চাপাতে হবে এবং বাইরেও তাদের ওপরে জোর করে পুরুষের সমান বোঝা চাপানো যাবে না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেছে যে, একটা গৃহের অভ্যন্তরীণ পরিচালনাকে যদি দায়িত্ব পালনের একটা বিশেষক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এবং তা যদি কোন নারী, অথবা কোন পুরুষের ওপরে বর্তানো হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, পুরুষের চাইতে নারী অনেক বেশী দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করছে। একই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের লালনের যে দায়িত্ব নারীদের ওপর, তাও প্রকৃতিদত্ত। এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও পুরুষরা সামান্যই অংশ নিতে পারে।

নারীদেরকে পুরুষদের চাইতে অধিক অধিকার দিতে হবে আসলে ঘরে থাকবার জন্য। যদি একই সময়ে তাদেরকে তাদের জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব পালনেও ব্যাপৃত থাকতেই হয়, তাহলে তারা হাতে যে সময়টুকু পাবে, তা তাদের নিজেদের জন্য বা গোটা সমাজের জন্য কাজে লাগাতে হবে। এথেকেই এসেছে সেই কনসেপ্ট বা ধারণা– 'নারীর স্থান ঘরে"। অবশ্য এমনও কোন কথা নেই যে, তারা তাদের বোরকা বা এপ্রনের ভেতরেই আটকে থাকবে, কিংবা ঘরের চার দেওয়ালে মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকবে। ইসলাম কোন ক্ষেত্রেই নারীর অধিকার খর্ব করে না। তারা তাদের অবসর মুহূর্তে অবশ্যই বাইরে যাবে তাদের কোন প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কিংবা তাদের পছন্দমত কোন সুস্থ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য। তবে, শর্ত এই যে, তারা যেন এমন কিছু না করে, যাতে ভবিষ্যৎ মানব-প্রজন্মের স্বার্থ ও অধিকার বিপদের সম্মুখীন হয়, যে স্বার্থ ও অধিকার আমানত স্বরূপ তাদেরই স্কন্ধে ন্যস্ত করা আছে। আর সব কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ, যেজন্য ইসলাম অতি-সামাজিকীকরণ বা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। কেননা, ইসলামের কথা হচ্ছেঃ "গৃহই নারীর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল" যা বর্তমান যামানার অধিকাংশ সমস্যার জন্যই অতি বিজ্ঞ ও বাস্তব সমাধান। নারীরা যখন তাদের কাজকর্মকে ঘরের বাইরে দূরে কোথাও সরিয়ে নেয়, তখন তা করতে হয় তাদের পারিবারিক জীবনের শান্তির বিনিময়ে, সন্তান পালনের দায়িত্বের বিনিময়ে।

'মা'কে কেন্দ্র করে, তাঁর চার ধারে আবর্তিত হয়ে যে পারিবারিক জীবন গড়ে ওঠে, তার জন্য প্রয়োজন অন্যান্য রক্ত-সম্পর্ককেও জোরদার করা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যথার্থ নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। পরিবারের ইউনিটিগুলো আলাদা আলাদাভাবে বাস করলেও একটা বৃহত্তর পরিবারের এই ধারণাকে ইসলাম যে সমস্ত কারণে সমর্থন করে এবং উদ্বুদ্ধ করে, তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছেঃ

১) বৃহত্তর পরিবার সমাজের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হওয়াকে প্রতিরোধ করে,

২) যদি একটা পরিবারের মধ্যকার ভাইবোন, পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র ইত্যাদি সম্পর্কের মধ্যে অটুট ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার বন্ধন সৃষ্টি করা যায়, তাহলে এর মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই একটা পরিবারের সামগ্রিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে এবং তা রক্ষা পাবে। স্বাভাবিক এই বন্ধন সত্যিকারের সমন্বয় ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে অন্যান্য আত্মীয়তার বন্ধনের মাধ্যমে আরও বেশী মজবুত হবে। যেমন, চাচা-চাচী, ফুপু-ফুপা, মামা-মামী, খালা-খালু, ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নি, চাচাতো-মামাতো-খালাতো-ফুপাতো ভাইবোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, নাতি-পুতি ইত্যাদি বন্ধনের মাধ্যমে। 'আমরা নিজের'-এই সচেতনতাবোধ থেকে উদ্ভুত যে উষ্ণ সম্পর্ক এবং নির্মল আনন্দ তার অন্বেষণের নতুন নতুন রাস্তা তখন এই বৃহত্তর পারিবারিক পদ্ধতির স্বার্থে খুলে যাবে।

৩) এই অবস্থায় পরিবারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে পড়ার আশঙ্কা কমে যাবে। এক-পরিবার নামে একই ছাদের নীচে বসবাস করাটা আকৃষ্ট হতে থাকবে। আজকাল যেমন কেন্দ্রীয় আলোকবর্তিকাস্বরূপ মুরব্বীদের মাঝে দেখা যায়। প্রায় সবদিকে পরিবারের কর্মকাণ্ড এই অক্ষের চারিধারে আবর্তিত হতে থাকবে। কোন নিঃসঙ্গ, ভুলে যাওয়া, কোন প্রত্যাখ্যাত বা অবহেলিত ব্যক্তি তখন সামাজিক ব্যবস্থার চিলে-কোঠায় বা মেঝের তলার ঘরে পড়ে থাকবে না, অথবা পরিবার থেকে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মত বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে না।

এটাই হচ্ছে প্রকৃত-বাস্তব, গৃহ ও পরিবার সম্পর্কে ইসলামী ধারণা বা কনসেপ্ট, যা কিনা সমাজের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ইউনিট হিসেবে পরিগণিত। দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের জন্যই প্রধানতঃ আজ আমরা পৃথিবীর আধুনিক সমাজগুলোতে এমন বহু ঘটনা দেখতে পাচ্ছি যে, পরিত্যক্ত, বৃদ্ধ, অথবা অকর্মণ্য পিতামাতাকে পরিবারের বোঝা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

(চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৭১)

(২) আহমদীয়া সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য বয়আত সংক্রান্ত বিষয়টির মধ্যে বিরুদ্ধবাদী অপ-প্রচারকারীদের অনেক প্রশ্নের জবাব রয়েছে–

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ-যুগে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং হারানো ঈমান পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ানে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। তিনি এসে ইসলামের খাঁটি-শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বাসিত করার জন্য ১৮৮৯ (১৩০৬ হিজরী) সনে আল্লাহ্‌র আদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২৬ হিজরীতে তাঁর মৃত্যুর পর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐশী-খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে পঞ্চম খলীফার যুগ চলছে। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। বর্তমানে (২০১৭ সনে) এই ঐশী-জামা'ত বিশ্বের ২১০টি দেশে একক ঐশী নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে রত। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কোন নতুন ধর্মের অনুসারী নয়। এই জামাত সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলামের শিক্ষা হতে চুল পরিমাণ বিচ্যুতিকেও নাজায়েয বলে মনে করে। এই জামাত ইসলামের শিক্ষার বিন্দুমাত্র কম-বেশি করাকে অপরাধ জ্ঞান করে। এ জামাত খাঁটি ইসলামের প্রকৃত স্বচ্ছ-সজীব, নির্মল ও সুন্দর রূপ জগদ্বাসীর সামনে উপস্থাপন করে থাকে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর ওপর নাযিলকুত কুরআনের বিসমিল্লাহর "বে" থেকে নিয়ে ওয়ান্‌নাস-এর 'সীন' পর্যন্ত প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও আয়াতের ওপর এবং প্রত্যেকটি যের ও যবরসহ পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। আমরা এও বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অঙ্গীকার অনুযায়ী সর্বকালে অলৌকিকভাবে এর সংরক্ষণ ও হিফাযত করে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন। তাই কুরআনের কোন আয়াত তো দূরের কথা এর কোন যের বা যবরও পরিবর্তন করা বা রহিত করার সাধ্য কারও নেই। কুরআন মজীদের অটল ও অমোঘ শিক্ষা "ধর্মে জবরদস্তি নেই" (২:২৫৭)-এর আলোকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ধর্মের ব্যাপারে কোন ধরনের বলপ্রয়োগ বা বাড়াবাড়িতে বিশ্বাসী নয়। আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, ইসলাম প্রচারের জন্য কখনো বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় নি এবং হবেও না।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা দাবী করেছেন যে, ইসলামের পুনর্জাগরণ ও বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেগুলো অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীলে মসীহ্ (মসীহ্ সদৃশ) রূপে আবির্ভূত করেছেন। তাঁর মোকাম ও মর্যাদা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সন্তান ও সেবক স্বরূপ মাত্র। মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে বয়আতকারী আহমদী তরীকার মুসলমানরা আজ সারা পৃথিবীতে এক মহান আদর্শিক সংগ্রাম এবং আধ্যাত্মিক জেহাদে রত। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক লিখিত ৮৮ খানা পুস্তক এবং অন্যান্য প্রচারপত্র, পুস্তকাবলী এবং সুবিশাল প্রচার কার্যক্রম এবং বর্তমানে M.T.A নামক টি.ভি চ্যানেল, www. alislam.org ইত্যাদি ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফাতুল মসীহ্ সমীপে বয়আতের আবেদন পত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকে (সার সংক্ষেপ)।

উল্লেখ্য, এ বিষয়গুলোর মধ্যে আপত্তিকারীদের অনেক প্রশ্নের জবাব রয়েছে

* বয়আতকারীকে সর্বপ্রথমে কলেমা শাহাদাত পাঠ করতে হয়।

* বয়আতকারীকে হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে 'খাতামান নবীয়্যীন' বলে দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করতে হয়।

* হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদত্ত শুভ-সংবাদ অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে 'মসীহ্ মাওউদ' ও 'ইমাম মাহদী' বলে মান্য করার জন্য বয়আতকারীকে অঙ্গীকার করতে হয়।

* বয়আতকারীকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক নির্ধারিত বয়আতের দশটি শর্ত পালন করতে সর্বদা চেষ্টা করার অঙ্গীকার করতে হয়। (নিচে দশটি শর্ত দ্রষ্টব্য)

* আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খেলাফতের সাথে সর্বদা বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করার এবং খলীফাতুল মসীহ্-এর সকল কল্যানময় নির্দেশ পালনে সচেষ্ট থাকার জন্য বয়আতকারীকে অঙ্গীকার করতে হয়।

* অত:পর বয়আতকারীকে দোয়ায়ে ইস্তেগফার চারবার এবং "রাব্বি ইন্নী যালামতু নাফসী ...ইল্লা আনতা", দোয়াটি পড়তে হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়'আত গ্রহণের দশটি শর্ত:

১। বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্ত:করণে অঙ্গীকার করিবে যে, এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (খোদাতাআলার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

২। মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন, উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের প্রদি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহতাআলার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তা'রীফ (প্রশংসা) করিবে।

৪। উত্তেজনার বশে, অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষত: কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতাআলার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দু:খ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

৭। ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবে।

৮। ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

৯। আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০। বয়আত গ্রহণকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিব। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতা বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্নীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (ইশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

[চলবে]

তাহরীকে জাদীদঃ জিহাদ বিল মা'ল কল্যাণমণ্ডিত মহান এক ঐশী পরিকল্পনা

মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান
মুরব্বী সিলসিলাহ

আল্লাহ্ তা'লা জগতের কল্যাণার্থে নবী রসূল পাঠান। আর প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করেই সৎকর্মশীলরা খোদার নৈকট্য লাভ করে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী কখনো প্রাণ বিসর্জনের প্রয়োজন পড়ে, যুদ্ধের প্রয়োজন পড়ে আবার ধন-সম্পদের প্রয়োজন পড়ে। বর্তমান যুগে যেহেতু আল্লাহ্ তরবারির যুদ্ধ রহিত করেছেন তাই এযুগে অন্যতম জিহাদ হল জিহাদ বিল মাল। আর্থিক কুরবানী আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক আবিষ্কৃত কোন জিনিষ নয় বরং এটি ইসলামের অবশ্যকরণীয় শিক্ষাগুলোর একটি। আর্থিক কুরবানীর ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۷﴾

অর্থাৎ- অতএব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যতটুকু তোমার যোগ্যতা রয়েছে এবং শুন ও আনুগত্য কর এবং খরচ কর কেননা এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যে নিজেকে কৃপনতা থেকে রক্ষা করে এরাই এমন লোক যারা সফলকাম হবে। (সূরা তাগাবুন: আয়াত ১৭)

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۸﴾

অর্থাৎ- তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তাহলে তিনি তা তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিবেন। এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ্ পরম গুণগ্রাহী ও পরম সহিষ্ণু। (সূরা তাগাবুন: আয়াত ১৮)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۵۵﴾

অর্থাৎ- হে যারা ঈমান এনেছ! আমরা তোমাদের যা দিয়েছি সে দিন আসার পূর্বে তা থেকে খরচ কর যেদিন কোন রকম ব্যবসাবাণিজ্য, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ চলবে না। আর কাফিররাই যালিম। (সূরা বাকারা: ২৫৫)

অতএব এসব আয়াত হতে স্পষ্ট, খোদার পথে খরচ করা একজন মোমেনের জন্য একান্ত আবশ্যক একটি বিষয়। যারা খোদার রাস্তায় খরচ করেন তারাই সফলকাম হবেন এবং আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে কল্যাণরাজী লাভ করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যেন বলছেন, খোদার রাস্তায় তোমাদের খরচ করা এমন যেমন তোমরা আল্লাহ্‌কে কোন ঋণ দিয়েছ এবং আল্লাহ তা'লা সেই সত্তা যিনি বান্দাকে তাঁর কুরবানীর প্রতিদানে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'লা অমুখাপেক্ষি এবং সর্বনির্ভরস্থল আমাদের টাকা-কড়ির তার কোন প্রয়োজন নেই। মূলত, আমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, আমাদের আনুগত্যের মান দেখার জন্য, আমাদের তাকওয়ার পথ অন্বেষণ করা প্রত্যক্ষ করার জন্য খোদা তা'লা বলেন, তাঁর রাস্তায় খরচ কর, তাঁর ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য খরচ কর।

হযরত আবু হুরায়ার (রা.) বলেন, মহানবী (সা:) বলেছেন- দানশীলতা বেহেশতের একটি বৃক্ষ স্বরূপ। যে ব্যক্তি দানশীল সে যেন এর একটি শাখা ধরেছে আর এই শাখা তাকে যতক্ষণ জান্নাতে না পৌছাঁবে ততক্ষণ ছাড়বে না।"

হয়রত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন- দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য পেয়ে থাকে, জান্নাতের নিকটবর্তী থাকে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট হতে এক ফিদিয়া চায়। তা কী? তা হলো, এ পথে আমাদের মৃত্যুবরণ। ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমা-বিকাশ নির্ভর করে এ মৃত্যুর উপরই। অন্য কথায় এরই নাম ইসলাম। খোদা তা'লা এখন এই ইসলামকে জীবিত করতে চাচ্ছেন। এ মহান অভিযানকে কার্যকর করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সব দিক থেকে ফলপ্রসূ এক বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যক ছিল। তাই সেই মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান খোদা এ অধমকে সংস্কারের জন্য পাঠিয়ে এমনটিই করেছেন। আর জগদ্বাসীকে সত্য ও সততার প্রতি আকর্ষণ করার জন্য সত্যের সাহায্য ও ইসলাম প্রচার কার্যকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করেছেন। বস্তুত এ সকল শাখার মধ্যে একটি শাখা হলো প্রণয়ন ও প্রকাশনা কার্যক্রম।" (ফতেহ ইসলাম: ১১ ও ১২)

হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) বলেন, "তোমরা খোদার রাস্তায় তোমাদের অর্থ সম্পদ খরচ করা ব্যতিত সেই পুণ্য অর্জন

করতে পারবে না, যা তোমাদেরকে নাজাত দান করবে।"

হয়রত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তাঁর গত ৭ জানুয়ারী ২০১১ ইং সালের খুতবায় এ বিষয়ে বলেন, "খোদাতালার রাস্তায় আর্থিক কুরবানী করা এটাও খোদা তা'লার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলীর একটি। এ বিষয়ে সূরা বাকারার প্রাথমিক আয়াতেই বলা হয়েছে- কুরআন করীম মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক। আর মুত্তাকী হলো তারা যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমরা যা কিছু দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। সুতরাং এই তিনটি বিষয় মুত্তাকী হওয়ার জন্য এবং কুরআন করীম থেকে পথ নির্দেশিকা লাভের জন্য আবশ্যকীয়।"

এবার আসা যাক তাহরীকে জাদীদের প্রসঙ্গে। ১৯৩৪ সনে মজলিসে আহরার জামা'তের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র রচনা করে এবং বলে, তারা জামাতকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে।

এর প্রতিউত্তরে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি আহরারীদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যেতে দেখছি এবং আহরারীরা বলে, তারা জামা'তকে ধ্বংস করে দিবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন এক পরিকল্পনা (তাহরীকে জাদীদ) সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন যার ফলশ্রুতিতে জামা'ত বিশ্বের সকল দেশে বিস্তৃতি লাভ করবে এবং এ জামা'তকে ধ্বংস করতে পারে এমন কেউ থাকবে না। অতঃপর তখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের সূচনা করেন এবং এই তাহরীক সম্পর্কে বলেন, "তাহরীকে জাদীদ প্রবর্তনের কারণ হলো, এর মাধ্যমে আমাদের কাছে এমন অর্থ একত্রিত হবে যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নাম বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছে দেয়া যাবে।" (খুতবা জুমআ ২৭ নভেম্বর ১৯৪২) তাহরীকে জাদীদের বছর ১লা নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৩১শে অক্টোবর শেষ হয়।

প্রথম দিকে এই তাহরীক অস্থায়ী ও নির্ধারিত সময়ের জন্য ছিল কিন্তু যখন এই তাহরীকের উনিশ বছর পূর্ণ হলো তখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "যখন উনিশ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি এ তাহরীককে ততদিন পর্যন্ত বহাল রাখবো যতক্ষণ তোমাদের নিঃশ্বাস থাকবে।" (খুতবা জুমআ ২৭ নভেম্বর ১৯৫৩)

তিনি আরো বলেন, "আমি আশা করি, তাহরীকে জাদীদের এই যুগ অসীম হবে এবং যেভাবে আকাশের তারকা গণনা করা যায় না তেমনিভাবে তাহরীকে জাদীদের যুগও গণনা করা যাবে না। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে বলেছিলেন, তোমার বংশধর গণনা করা যাবে না। আর হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর ধর্মের অনেক কাজ করেছে একই অবস্থা তাহরীকে জাদীদের জন্য প্রজোয্য...।" (খুতবা জুমআ ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫)

৯ নভেম্বর ১৯৩৪ জুমআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদে শামিল হবার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "যদিও এ চাঁদায় অংশগ্রহণ করা ঐচ্ছিক কিন্তু **যে ব্যক্তি এতে অংশগ্রহণ করার সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও খলীফায়ে ওয়াক্ত এতে অংশগ্রহণ করাকে ঐচ্ছিক রেখেছেন ভেবে এতে অংশগ্রহণ করে না এমন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে এ দুনিয়াতেই বা মৃত্যুর পর পরকালে ধৃত হবে।** ..."

প্রাথমিক অবস্থায় তাহরীকে জাদীদে শামিল হবার উন্নত মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "এই তাহরীকের অধিনে আমার দ্বিতীয় দাবী হলো, জামা'তের সামর্থ্যবান সদস্য একশত টাকা করে বা এর চেয়ে বেশী দিতে পারেন। এই তাহরীকে চাঁদা দিয়ে পুণ্য অর্জন করুন।... এই তাহরীকে গরীবদেরও অংশগ্রহণের অনুমতি আমি দিচ্ছি, যারা পাঁচ টাকা করে হলেও দিতে পারেন তারাও এই তাহরীকে অংশগ্রহণ করতে পারেন।" (আলফজল কাদিয়ান ২৯ নভেম্বর ১৯৩৪)

তাহরীকে জাদীদের মত মহান তাহরীকে প্রত্যেক সদস্যকে নিজের জন্য কুরবানীর মান নিজেই ঠিক করতে হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত করার সময় তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এবং জাতীয় ব্যাপক দায়িত্ববোধের পাশাপাশি জামা'তের খলীফাদের নির্দেশনাও দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হার নির্ধারণের বিষয়ে বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি নিজের মাসিক আয়ের অর্ধেক দিয়ে দেয়, উদাহরণ স্বরূপ, তার একশত টাকা মাসিক আয় হলে পঞ্চাশ টাকার ওয়াদা লেখায়। এমন করলে বুঝা যাবে, সে ভালো কুরবানী করেছে। আর সে যদি এক মাসের পুরো আয় অর্থাৎ একশত টাকার মাঝে একশত টাকারই ওয়াদা লেখায় তাহলে আমি মনে করবো, সে কষ্ট স্বীকার করে কুরবানী করেছে।" (খুতবা জুমআ ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৬৯ সালের মজলিসে শূরায় তাহরীকে জাদীদের ওয়াদাসমূহের হার সম্পর্কে বলেন, "তাহরীকে জাদীদের প্রথম দিন থেকেই ঐচ্ছিক কুরবানী হিসাবে পরিগণিত ছিল।... তাহরীকে জাদীদের চাঁদা মাসিক কমপক্ষে ১/৫ হওয়া উচিত। তবে এর অংশ নির্ধারিত নয়।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর হৃদয়ে পুরো বিশ্বের প্রয়োজন ও চাহিদাকে সামনে রেখে যে আকাঙ্খার সৃষ্টি হয়েছিল তা হলো, অর্থ বেশী হলে আমরা ইসলামের বিজয়াভিযানে অধিক গতি সঞ্চার করতে পারবো। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আহমদী যুবকদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে বলেন, "... আপনাদের প্রতিবেশীর মাঝে বা আপনাদের গ্রামে বা আপনাদের মহল্লায় যদি কোন এমন আহমদী থাকেন যিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করে নি তাহলে আপনারা তাকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবেন। এমনকি একজন আহমদীও যেন এমন না থাকেন যিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশ নিচ্ছেন না।..." (২৩ অক্টোবর ১৯৫০ সনে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরা খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকযিয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ২৫ অক্টোবর ১৯৮৫ জুমআর খুতবায় তাহরীকে

আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন এক পরিকল্পনা (তাহরীকে জাদীদ) সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন যার ফলশ্রুতিতে জামা'ত বিশ্বের সকল দেশে বিস্তৃতি লাভ করবে এবং এ জামা'তকে ধ্বংস করতে পারে এমন কেউ থাকবে না।

জাদীদের চাঁদার কুরবানীর বিষয়ে বলেন, "তাহরীকে জাদীদ যা-ই আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করেছে প্রত্যেক আগত বছর আল্লাহ্ তা'লা তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর এই জামা'ত অতি অস্বাভাবিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। **... যত চাঁদাই বেড়েছে এর সবই হলো তাহরীকে জাদীদ চাঁদার বাচ্চা বা প্রতিফল। যদি কাদিয়ানের গরীব লোকেরা এবং হিন্দুস্তান জামা'তের সদস্যরা ছাগল বিক্রি করে, কাপড় বিক্রি করে এবং মাসের পর মাস দুই টাকা করে জমিয়ে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা না দিতেন তাহলে আজ এই কোটি টাকার বাজেট হতো না। বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকা এবং অন্যান্য জামা'তে যত চাঁদা আপনারা দেখছেন তার সবই তাহরীকে জাদীদের চাঁদারই বরকত যা সূচনালগ্নে দেয়া হয়েছিল এবং একান্ত দোয়ার মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল।** এ চাঁদায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। পুণ্যের সে এক অতুলনীয় অবস্থা ছিল। তখন যেভাবে বিভিন্ন চাঁদা দেয়া হতো সেসব চাঁদা দেয়ার দৃশ্য এমন ইতিহাসের পাতায় এমন দৃশ্য বিরল। বেশ কয়েক মাসের বেতন আঞ্জুমানের গরীব কর্মচারীরা দিয়ে দিত। আজও এমন দৃশ্য সারা বিশ্বে বিস্তৃত হচ্ছে এবং আহমদীয়াতের কল্যাণে খুই সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু এসবের সূচনা কাদিয়ান থেকে হয়েছে। আর এসব মালি কুরবানীর উদ্দিপনা ও প্রেরণা সৃষ্টিতে তাহরীকে জাদীদ যে ভূমিকা পালন করেছে তা আমরা কোনভাবে উপেক্ষা করতে পারি না।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাহরীকে জাদীদ চাঁদায় কীভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত এ বিষয়ে বলেন, **"চাঁদা আ'ম এর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাঁদা হলো তাহরীকে জাদীদের চাঁদা। এর মাঝে অতীব কল্যাণ নিহিত।** সূচনা থেকেই এই চাঁদা জামাতের মালী কুরবাণীর ওপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই আর্থিক কুরবানীর (অর্থাৎ তাহরীকে জাদীদের) দর্শন হযরত ফজলে ওমর (রা.) বর্ণনা করতে গিয়ে এ বিষয়েরও জোর তাগীদ দিয়েছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে খরচ বাঁচিয়ে যত বেশি সম্ভব আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা উচিত।" (জুমা'র খুতবা ৫ নভেম্বর ১৯৯৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "এযুগে আর্থিক কুরবানীর অনেক প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যেক নারী পুরুষকে সাদা-সিদে জীবন যাপন করতে হবে এবং খরচাদি কম করতে হবে যেন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যেকোন মুহূর্তে কুরবানী করার জন্য ডাক পড়লে তারা প্রস্তুত থাকে। কুরবানী করার জন্য শুধু তোমাদের নিয়ত বা ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট হবে না যদি তোমাদের কাছে কুরবানী করার মত জিনিষ না থাকে। এক অন্ধ জিহাদের জন্য যত আগ্রহই রাখুক না কেন সে জিহাদের অংশগ্রহণ করতে পারে না। একজন গরিব ব্যক্তি যাকাত দেয়ার যত ইচ্ছাই করুক না কেন সে যাকাত দিতে পারে না। একজন অসুস্থ শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে পারে না। তাই, যদি জিনিষ হাতে না থাকে তাহলে আমরা সেই কুরবানী কখনই করতে পারবো না যা আমরা ইচ্ছা করি। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত সাদা-সিদে জীবন যাপন করা, সুযোগ এলে যেন সে নিজেকে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থাপন করতে পারে।" (আলফজল কাদিয়ান, ১২ জুন ১৯৩৫)

বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিসরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলাম প্রচারের এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের জন্য নানা ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। যেমন মসজিদ নির্মাণ, মিশন হাউজ নির্মাণ, মিশনারী নিযুক্ত করা, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল, বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্র ইত্যাদী আরো যুগোপযোগী কর্মকাণ্ড অব্যহত আছে। এসব কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তাই আহমদীয়া জামাতের সকল সদস্যের এদিকে অর্থাৎ জিহাদ বিল মালের দিকে গুরুত্বের সাথে এগিয়ে আসা উচিত। সবশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি বাণী দিয়ে শেষ করছি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, **"পৃথিবীতে মানুষ অর্থকে অনেক বেশী ভালোবাসে, আর এ কারণেই স্বপ্নের তাবীরের গ্রন্থে লেখা আছে, যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে তার কলিজা বের করে কাউকে দিয়ে দিয়েছে এর অর্থ হলো– ধন-সম্পদ। একারণেই প্রকৃত তাকওয়া এবং ঈমান অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বূন। প্রকৃত পুণ্য তুমি কখনও অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ হতে খরচ না করবে।"**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে বেশি বেশি মালী কুরবানী করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(৭ম কিস্তি)

প্রাণপ্রিয় হুযুর (রাহে.)-এর উদারতা ও ভালবাসা

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) আমার সাথে অত্যন্ত উদারতা ও ভালবাসার ব্যবহার করতেন। সত্যিকার অর্থে হুযুরের উদারতা বর্ণনা করা কষ্টকর। তবু আমি কিছুটা বর্ণনা করতে চেষ্টা করছি। ১৯৭০ সালের কথা। জলসা সালানায় বাংলাদেশ থেকে যারা গিয়েছিলেন, হুযুরের সাথে তাদের মোলাকাত ছিল। সেসময়ের পূর্ব পাকিস্তানের আমীর সাহেবকে হুযুর বললেন, ইমদাদুর রহমান তো আমার ঘরের ছেলের মত, ঘরের জন্য দুশ্চিন্তা করে না। হুযুরের এই মন্তব্য আমার সাহস ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট ছিল। এর পরে আমি যখন হুযুরের সামনে গেলাম, তখন হুযুর আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি বাঙালী কবে থেকে হলে? তুমি তো রাবওয়ার বাসিন্দা"। হুযুরের ভালবাসা পূর্ণ এই মন্তব্যে উদারতা, দয়া ও মমতার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রতিক মামলায় যখন আমি চিনিউট থানা থেকে মুক্তি পেয়ে হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখনও হুযুর আমাকে সান্তনা আর ভরসা দিলেন, সাহস যোগালেন। লাহোর কেল্লা থেকে মুক্তি পেয়ে যখন আমি রাবওয়া পৌঁছলাম, হুযুর (রাহে.) তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ত সময় থেকেও সময় বের করে আমাকে সাক্ষাতের সময় দিলেন। ব্যস্ততার মাঝেও যখনই হুযুর আমার আসার খবর পেলেন, তখনই আমাকে ভেতরে ডাকলেন আর আমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরলেন। সেই স্নেহের স্পর্শে যে অনুভূতি হল... তা আসলে ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। কোলাকুলির সাথেই হুযুর জিজ্ঞেস করলেন,'জোরপূর্বক কোন বয়ান (বক্তব্য) লিখিয়ে নেয়নি তো?' 'কোন সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয়নি তো?' আমি বললাম যে না কিছুই করেনি। কিন্তু আমি খুবই আশ্চার্যান্বিত হলাম যখন হুযুর জিজ্ঞেস করলেন মারধর করেছে কি না? আমি বললাম, হ্যাঁ। হুযুর জানতে চাইলেন 'অল্প মেরেছে?' আমি বললাম, 'জ্বী হুযুর।'

আশ্চর্যের বিষয় হল, যখন থেকেই আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি, আমি কাউকেই বলিনি যে জেলে আমাকে মারধর করা হয়েছিল। কিন্তু হুযুর (রাহে.) এর প্রশ্নের জবাবে বলেছি জ্বী হ্যাঁ। আমার ধারনা ছিল যে হুযুর এই মামলা সম্বন্ধে হয়তো উমুরে আম্মাকে বলে দিয়েছিলেন যেন তিনি এই কেস এর দিকে লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু পরবর্তীতে যা কিছু জানতে পারলাম তা এই যে, যখনই হুযুর আমার গ্রেফতারের খবর পেয়েছিলেন, হুযুরের নির্দেশে উমুরে আম্মার প্রতিনিধিদের মাঝে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাত দশটার মধ্যে উকিলের সাথে পরামর্শ করে পরবর্তী দিন লাহোর হাইকোর্টে রিট পিটিশন করা হয়েছিল। এছাড়া হুযুরকে প্রতিদিন আমার কেস এর রিপোর্ট দেয়ার জন্য মুকাররম নুরুল হক তানভীর সাহেব ও উমুরে আম্মার চৌধুরী রশীদ আহমেদ সাহেবকে ডিউটি দিয়েছিলেন। আমি আরও জানতে পেরেছিলাম যে তানভীর সাহেব এর লাহোর থেকে ফেরত আসতে প্রায় সময় বেশ রাত হয়ে যেত। কিন্তু তারপরও হুযুরের খেদমতে হাজির হয়ে তাঁকে তাঁর কার্যকলাপ এর রিপোর্ট পেশ করতে হত।

লাহোর শাহী কেল্লার জেল সাধারণ জেল ছিল না। এখানে রাষ্ট্রদ্রোহী অথবা বিদেশী গুপ্তচর এবং এ ধরণের কয়েদীদেরকে রেখে চরম নির্যাতন করা হত। তাই হুযুর (রাহে.) খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

উকিল সাহেব বলেছিলেন তিনি পূর্বেও হুযুরের নির্দেশে মামলা পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু এর আগের কোন কেসের ব্যাপারে কখনও তিনি হুযুরকে অনেক বেশী উতলা আর উদ্বিগ্ন দেখেননি। হুযুর (রাহে.) উকিল খাজা সারফারাজ সাহেবকে বলেছিলেন যে, যতক্ষণ এই মামলার কাজ শেষ না হয়, ততক্ষণ অন্য কোন কাজ তিনি করবেন না। মুকাররম খাজা সারফারাজ সাহেব,জামাতে আহমদীয়া লাহোরের আমীর চৌধুরী আসাদুল্লাহ খান সাহেবের জামাই এবং শীয়ালকোটের সাবেক আমীর আবদুর রহমান সাহেবের ছেলে ছিলেন। এমনকি ১৮ই নভেম্বর যেদিন আমার মামলার কার্যক্রম শেষ হল আর আমি মুক্তি পেলাম, সেদিন উকিল সাহেব সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন খাবার খাননি, কেবল চা-বিস্কুট খেয়ে কর্মরত থেকেছেন।

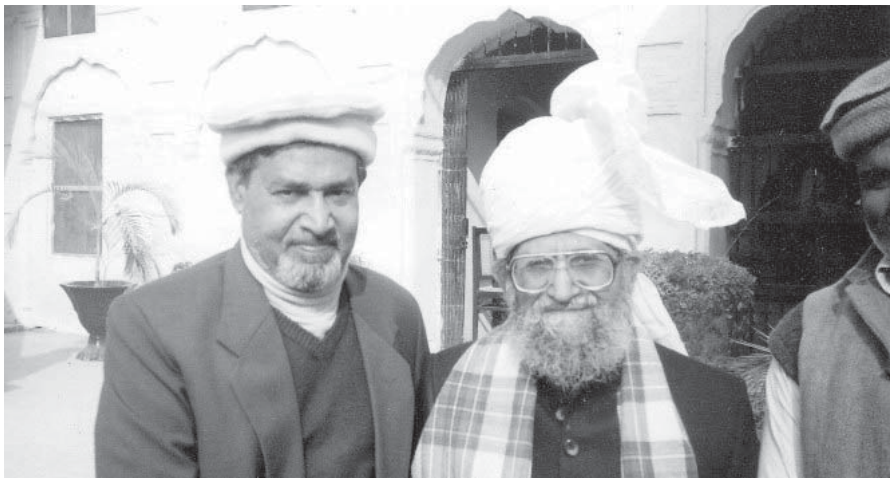

আহমদীয়াতের ইতিহাস লেখক মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব-এর সাথে লেখক

আমার এই মামলাটি হুযুরসহ সমগ্র জামাতের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল। মুকাররম মাহমুদ আহমদ বাঙালী সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ্ আমাকে বলেছিলেন যে, বেশ কয়েকবার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময় হুযুর তাঁর কাছে এই বান্দার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি কোন কাজে হুযুরের কাছে গিয়েছিলেন। হুযুর দূর থেকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ইমদাদুর রহমান চলে এসেছে? তিনি জবাবে বললেন, এখনও না। হুযুর তখন বললেন, তোমরা তাহলে কী করতে এসেছ? (ফিদাহু নাফসি, ওয়া আবি ওয়া উম্মি - আমি, আমার মা, বাবাও হুযুরের খাতিরে কুরবানী হতে প্রস্তুত)

আমার কাছে সে ভাষা নেই, যার দ্বারা আমি হুযুরের অসাধারণ দয়া, ভালবাসা আর সহানুভূতির কথা বর্ণনা করব বা হুযুরের শুকরিয়া জ্ঞাপন করব। এই অধম, অযোগ্য বান্দার প্রতি হুযূরের অসংখ্য দয়া রয়েছে।

জামেয়ার সদস্যবৃন্দ

জামেয়ার সদস্যবৃন্দ অর্থাৎ জামেয়ার ওস্তাদগণ আর ছাত্ররা কিভাবে আমার এই দুর্ঘটনায় কতটা প্রবলভাবে মর্মাহত হয়েছিল তা বর্ণনার মত নয়। জেল থেকে বের হবার পর আমি আমার জন্য যে ভালবাসা জামেয়ার সদস্যদের হৃদয়ের মধ্যে দেখেছি তা বর্ণনা করতে অক্ষম। আমি ১৯ নভেম্বর রাতে রেলগাড়িতে করে রাবওয়া রেল স্টেশনে পৌঁছেছিলাম। কেউ সঠিকভাবে জানত না যে আমি ঠিক এই গাড়িতে করেই আসছি। যদিও হোস্টেলের ছাত্রদের বারণ করা হয়েছিল, তবুও রাবওয়া রেলস্টেশনে বিপুল সংখ্যক ছাত্র জমায়েত হয়ে গিয়েছিল। জামেয়ার ছাত্ররা ছাড়াও অন্যান্য অসংখ্য লোকজন স্টেশনে এসেছিল। ইসলামের অপূর্ব শিক্ষার নমুনা আহমদীদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ছাত্ররা হুড়মুড়িয়ে এই বান্দার দিকে দৌড়ে আসল। ট্রেন ভাল করে থামার আগেই পাঁচ ছয়জন ছাত্র আমাকে ঘিরে ধরল। এরপর প্রায় আধঘন্টা ধরে সবার সাথে সাক্ষাত করতে থাকলাম। প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসার সাথে আমাকে আলিঙ্গন করছিল আর আমি তো একা সবার মাঝে অস্থির। আমার মত অধমের সাথে এই আচরণ শুধুমাত্র আহমদীয়াতের সম্পর্কের কারণে। নতুবা এদের মধ্যে তো কেউ আমার আপন ভাই ছিল না বরং আপন ভাইয়ের থেকেও বেশী কিছু ছিল। আর এরপর দীর্ঘদিন দাওয়াত খাওয়া চলতে থাকল। সকলের এত উৎসাহ ও আনন্দের এটিও কারণ ছিল যে, ঐ সময় অসংখ্য আহমদী বিভিন্ন মামলার জালে বাঁধা পড়ে জেলে কষ্ট পাচ্ছিলেন। আমিই প্রথম জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম।

জামেয়ার সদস্যবৃন্দ আর রাবওয়াবাসী আহমদীয়াতের এই অধম সেবকের প্রতি ভালবাসা, স্নেহ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের অসাধারন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। তারা তো নিজেরাই নিজেদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী আর এই নমুনা শুধুমাত্র ঐশী জামাতে দেখতে পাওয়া সম্ভব, যেখানে সকলেই একই রজ্জুতে বাঁধা। যেখানে সকলেই এক দেহের বিভিন্ন অংশ হয়। একজনের কষ্টে সম্পূর্ণ দেহেরই কষ্ট হয় আর একজনের দুঃখে সকলেই দুঃখিত হয় আর আনন্দের সময়েও সবাই একই সাথে আনন্দিত হয়। জামেয়ার সদস্যবৃন্দের এই আচরণ আমাকে মৃত্যুর সময়েও প্রশান্তি দেবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে পুরস্কৃত করুন, আমীন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় ইতিহাস লেখক মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ (মরহুম) আমাকে পত্র মারফত জানিয়েছিলেন যে আমার এই মামলার বিষয়টি আহমদীয়াতের ইতিহাসের ১৯৭৪ সালের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

লাহোর শাহীকেল্লার কারাগার থেকে বের হওয়ার পর

লাহোর শাহী কেল্লার নির্যাতন কারাগার থেকে হাইকোর্টের নির্দেশে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বেরিয়ে আসলাম। আমার খুব মনে আছে, কমপক্ষে তিনদিন তিন রাত এক মুহূর্তের জন্য ঘুম আসে নি। মানসিকভাবে খুবই দুর্বল ছিলাম। দু'তিনদিন পরেই জামেয়ার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও ডিনার ছিল। হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানে আসতেন। সেদিনও এসেছিলেন। হুযুর (রাহে.)-এর সাথে বিভিন্ন গ্রুপ ফটো হতো। এবার তিনটি গ্রুপে আমি সদস্য ছিলাম। হুযুর (রাহে.)-এর সাথে আমাদের ফটো বানানো হয়েছিল। তখনো ভিডিও বা অন্যকিছু আসেনি। জামেয়ার ছাত্র ইউনিয়ন আল জমিয়াতুল ইলমিয়ার আমি আল আমিন (জেনারেল সেক্রেটারী) ছিলাম। মাওলানা নাসিম মাহদী সাহেব (অবসর প্রাপ্ত), মোবাল্লেগ ইনচার্জ কানাডা ও আমেরিকা আমাদের নায়েবুর রাইস ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ হোস্টেল প্রিফেক্ট ছিলাম। তৃতীয়তঃ মেস কমিটিতে বিভিন্ন সময় মেস-ম্যানেজার ও শেষে প্রেসিডেন্ট ছিলাম। শেষ বর্ষে জামেয়ার আচরণবিধি পুনর্বিবেচনা ও নবায়ন কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলাম। অতএব, তিনটি গ্রুপে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর সাথে ফটো বানানো হয়েছিল। এটি আমার বড় সৌভাগ্য ছিল, আলহামদুলিল্লাহ।

ফটো সেশনের সময় হুযুর (রাহে.) আমাকে দেখে বড় স্নেহপরবশ হয়ে বললেন, "নালায়েক কমজোর হোকে আয়া হ্যায়।"

ডান থেকে বসা– লেখক, ওস্তাদ মাওলানা গোলম বারী সায়েফ সাহেব,
চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.), প্রিন্সিপাল মালেক,
সাইফুর রহমান সাহেব ও সর্ববামে মাওলানা নাসিম মাহদী সাহেব

অযোগ্য, দূর্বল হয়ে এসেছে। অর্থাৎ আমি জেল থেকে দূর্বল হয়ে এসেছি।

তারপর তো সবাই আমাকে খুব আদর করতেন, স্নেহ করতেন। আমার জন্য সবাই খুব দোয়া করতেন। হযরত সাহেবের খানদানের সবাই খুব দোয়া করেছেন। আমিও সবার কাছে দোয়া চাওয়ার জন্য দেখা করার চেষ্টা করতাম। জামেয়ার প্রথম থেকেই আমি সাহাবায়ে কেরামের সাথে দেখা করতাম, দোয়া চাইতাম।

আমি তখন ছোট ছিলাম। সাহেবযাদা হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেব, পিতা সাহেবযাদা হযরত মির্যা সুলতান আহমদ, পিতা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তখন সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নাযেরে আলা ছিলেন। তিনি সাহাবী ছিলেন। একদিন একটি চিঠি লিখে তাঁর দফতরে রেখে এসেছিলাম। দু একদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখি নাযেরে আলা সাহেবের দফতর থেকে লোক এসে হাজির। নাযেরে আলা সাহেব আমাকে ডেকেছেন। আমি আশ্চর্য হলাম এবং হঠাৎ ভয়ও পেলাম। কী জানি কি হল, কেন ডেকেছেন। জামেয়া থেকে অনুমতি নিয়ে হাজির হলাম। হযরত মিয়া সাহেব অর্থাৎ নাযেরে আলা সাহেব আদর করে বসালেন। কেমন আছি, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বললেন, দোয়ার জন্য চিঠি কেন লিখলাম, দেখা কেন করলাম না? বললেন, দোয়ার জন্য পরিচয় দরকার, সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। আপনি কে, আপনার সম্পর্কে কিছু জানি না, এভাবে তো দোয়া হয় না। আগামীতে মাঝে মাঝে দেখা করতে বললেন। জাযাহুমুল্লাহ খায়রুল জাযা। এভাবেই বুযুর্গরা আমাদের তালীম-তরবীয়ত দিয়েছেন। আমি কোন সাহাবীকে এমন দেখিনি যে একবার দেখা হবার পর পুনরায় যখন দেখা করেছি তখন চিনতে পারেনি।

আমি আল জামীয়াতুল ইলমীয়ার (ছাত্র ইউনিয়ন) আমিন ছিলাম। প্রতিদিন জামেয়ার অষ্টম পিরিয়ডে (শেষ পিরিয়ডে) সকল ক্লাসের ছাত্রদের হাজির হওয়া জরুরী ছিল। ছাত্রদের বক্তৃতার সুযোগ দেয়া হত। শেষ পিরিয়ডের বক্তৃতার সময় সভাপতিত্ব করাও আমার (আল আমীন) দায়িত্ব ছিল। ছাত্রদের বক্তৃতার রুটিন তৈরি করে কয়েকদিন পূর্বেই নোটিশ বোর্ডে লাগানো হত। বছরে একবার আরবী, উর্দূ, ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা প্রতিযোগীতা করানো হত। মাস শেষে আমাদের কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রিন্সিপালের খেদমতে পাঠানো হত।

মাঝে মাঝে জামাতের কোন বড় অভিজ্ঞ আলেম এবং বিশেষ ব্যক্তিকে জামেয়ার ছাত্রদের সামনে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রন জানানো হত। আমরা হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব, আন্তর্জাতিক আদালতের চিফ জাস্টিস, {সাহাবী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)} কে আমন্ত্রন জানিয়েছিলাম। তিনি নিজ ব্যবস্থাপনায় লাহোর থেকে সময় মত এসে আমাদের জামেয়ার শেষ পিরিয়ডে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন। তারপর আমাদের সাথে দুপুরের খাবার খেয়েছিলেন। এমন বুযুর্গ মেহমানের আগমণ হলে আমাদের জামেয়ার শিক্ষকগণ এবং প্রিন্সিপাল সাহেব উপস্থিত থাকতেন। এ সময় মোহতরম মাওলানা মালেক সাইফুর রহমান সাহেব আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন যিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মুফতী সিলসিলাহ ছিলেন।

হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.) আমাদের মাঝে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তার সারাংশ আমার স্মরণ আছে। মোবাল্লেগগণ কুরআন, হাদীস, তওরাত ইঞ্জিল থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করবেন। কিন্তু দলীল প্রমাণ দেখে বিধর্মীরা মুসলমান হবে এটা আশা করা যায় না। তাহলে কী করণীয়? মোবাল্লেগ সাহেব তবলীগের পরে সেই যেরে তবলীগকে বলবেন, আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। সে বলবে কেন মুসলমান হব? আমার কী লাভ হবে? মোবাল্লেগ সাহেব বলবেন, আপনি মুসলমান হলে আমার মত হবেন। আপনি কেমন? আপনার কাছে কী আছে? মোবাল্লেগ সাহেব বলবেন, আল্লাহ তা'লা বিশ্বস্রষ্টা আমার দোয়া কবুল করেন, আমার ডাকে সাড়া দেন, উত্তর দেন। যদি আপনি এই কথা বলতে পারেন, তাহলে আপনি সফল! সুবহানাল্লাহ।

আমি বেশ কয়েকবার হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.)-এর সাথে দেখা করেছি। একবার যথারীতি পূর্ব নির্ধারিত সময়ে তাঁর কাছে গিয়ে দেখা করেছি। তিনি আমাকে চিনতেন। আমি চিঠি লিখেছি, তাঁর হাতের লেখা পত্র আমার কাছে আছে।

আমি মনে করি, আমার জীবনের বড় সঞ্চয় প্রথমত সাহাবায়ে কেরামের দোয়া। তারপর আমাদের বুযুর্গ ওসতাদগণের তা'লীম তরবীয়ত ও দোয়া। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের ওস্তাদ (শিক্ষকগণ) এত উন্নত চরিত্রের ছিলেন যে, তাঁরা তাদের আচরণ দিয়ে আমাদের বড় করে গেছেন।

(চলবে)

স্মৃতিচারণঃ

পানাউল্লাহ্ সাহেবের আহমদীয়াত জীবন

নূরজাহান বেগম

আমার পিতার নাম মোহাম্মদ পানাউল্লাহ্। তিনি প্রায় নব্বই বৎসর আগে এক সম্ভ্রান্ত সুন্নী মুসিলম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৭ সালের ৩ জানুয়ারি রোজ বুধবার সকাল ১০ টায় ইন্তিকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রাণপ্রিয় পিতাকে জান্নাতবাসীগণের অন্তর্ভুক্ত কর। আমার আব্বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে মেনে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। তখন আমাদের গ্রাম দূর্গারামপুরে আহমদীয়াতের প্রারম্ভিক কাল। পানাউল্লাহ্ সাহেব তখন তাঁর পরিবারে একমাত্র আহমদী।

আমার দাদাজানের নাম মোহাম্মদ আব্দুল গফুর। তিনি একজন ধর্মভীরু মুসলমান ছিলেন। কুরআন হাদীস জানতেন। প্রতি বৎসর রমজান মাসে মসজিদে ইতেকাফে বসতেন এবং তিনি হজ্জও করেছেন। তিনি তাঁর বাড়ীতে তখনকার দিনে পাকা মসজিদও নির্মাণ করেছেন। এই মসজিদে তিনি প্রতিদিন পাঁচ বেলার নামায আদায় করতেন। আজও বাড়ীর সব সদস্য এবং গ্রামের অন্যান্য মানুষ এই মসজিদে নামায পড়েন। আহমদীয়াতের বার্তা দাদাজানের কানে পৌঁছার পরও তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নি। এটাই ছিল আমার আব্বার সবচেয়ে বড় আক্ষেপ। আল্লাহ্ যাকে সঠিক পথ দেখান, একমাত্র তিনিই সঠিক পথের সন্ধান পান।

আল্লাহ্ তা'লার অপরিসীম রহমতে আমার আব্বা মোহাম্মদ পানাউল্লাহ্ সাহেব আহমদীয়াতের আলো লাভ করেছিলেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার। গ্রামে ফকির ইয়াকুব আলী নামে এক আহমদী ছিলেন। তিনি আহমদী জামাতের একজন প্রচারক ছিলেন। ইয়াকুব আলী সাহেব আমার আব্বাকে খুব ভালবাসতেন এবং আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমার দোয়া শুন, আমার দোয়া কবুল কর, আহমদীয়াতের তবলীগের জন্য সোনাউল্লাহ্ বাড়ীর পানাউল্লাহ্কে জামাতকে দান কর। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। আমার আব্বা পানাউল্লাহ্ সাহেব আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হলেন। ফকির সাহেব মারা গেছেন আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দান করুন। গ্রামের মধ্যে আমাদের পরিবারে তাঁর অনেক নাম যশ, প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। গ্রামের সবারই আমাদের বাড়ীর সাথে সুসম্পর্ক ছিল। সম্মান করত। আমাদের বাড়ীর নাম ছিল মৌলভী বাড়ী। মৌলভী বাড়ীর ছেলে হয়েও আহমদী হওয়ার পূর্বে আমার আব্বা তখনকার দিনে হারমোনিয়ম বাজিয়ে শরীয়তী, মারফতী, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি গান গেয়ে লোকদেরকে শুনাতেন। তার গানের সুর ছিল সুমধুর। গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে মেঘনা নদী বয়ে গেছে, আর পূর্বদিকে সবুজ ঘন ফসলের ক্ষেত। চমৎকার দৃশ্য বিরাজ করছে। কোথাও গানের আসর হলেই প্রথমেই আমার বাবার নাম প্রস্তাব করা হতো আর আব্বা হাসি মুখে সেখানে উপস্থিত হতেন। গান তিনি প্রচন্ড ভালবাসতেন। এই গানের মধ্যে তিনি খোদাকে পাওয়ার বেদনা প্রকাশ করেছেন। মানুষ তাঁর গানের মধুর সুরের মুর্ছনায় ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জেগে উঠতেন এবং বলতেন, সত্যিই পানাউল্লাহ্ একজন জাদুকর গায়ক। গানের মনমুগ্ধকর সুর প্রাণ ছুঁয়ে যায়, মন প্রভু স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। এই গানের মাধ্যমেই অনেক মানুষ আমার আব্বাকে চিনতেন। আব্বা ছোটকাল থেকেই খোদা-ভীরু, দয়ালু, পরোপকারী, উদার মনের মানুষ ছিলেন। অভাবী মানুষদেরকে তিনি সাহায্য করতেন।

সাত ভাইয়ের মধ্যে আব্বা ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁর সাহস ছিল প্রচণ্ড, স্বভাব ছিল নম্র, ভদ্র, বিনয়ী। বয়স অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষকে সম্মান, ভালবাসা এবং স্নেহ করতেন। আহমদী হওয়ার আগে তিনি গানের মাধ্যমে খোদাকে লাভ করার পথ খুঁজেছেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি সেই পথের সন্ধান লাভ করলেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

তিনি আল্লাহ্কে ভালবাসতেন, ভালবাসতেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে, ভালবাসতেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে।

আব্বা যখন আহমদী হন তখন দূর্গারামপুর ও আশপাশের গ্রামের মানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। তারা বলাবলি করতে থাকে, পানাউল্লা এমন একজন ভাল মানুষ, অথচ কাদিয়ানী হয়ে গেছে? কাদিয়ানী কি, মানুষ তা জানত না। ধর্মান্ধ মোল্লা লোকদের বুঝিয়েছে, পানাউল্লাহ্ খৃষ্টান হয়ে গেছে। ধর্মান্ধ মোল্লারা বুঝিয়েছে, কাদিয়ানীরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রথম এবং শেষ নবী মানে না। তাদের নবী হলো হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। কাদিয়ানীরা শিরক করে, ইত্যাদি সব মিথ্যা কথা (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক)। দাদাজান যখন জানতে পারলেন আব্বা আহমদী হয়ে গেছে, তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর মান, সম্মান, ইজ্জত সব যেন ধূলিতে মিশে গেল। তিনি পাগলের মত হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, সাতটি ছেলের মধ্যে আমার দ্বিতীয় ছেলেটি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, খোদাভক্ত, আর আজ সে নাকি কাদিয়ানী হয়ে গেল! এই কথা শুনার আগে আমার (দাদাজানের) মরণ হওয়াও তো ভাল ছিল! তিনি ছিলেন ধর্মান্ধ মোল্লাদেরই একজন। দাদাজান একদিন আব্বাকে ডেকে তাঁর কিছু না শুনার আগেই তাঁকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। আমার বাড়ীতে তোমার স্থান নাই। যেখানে খুশি সেখানে চলে যাও। উপায় না পেয়ে তিনি আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে কিছুদিন কাটালেন। বেশ কিছুদিন পর তিনি বাড়ীতে আসলেন। দাদাজান বললেন, বাড়ী এসেছ? গ্রামবাসী এবং মৌলভীরা তোমার

সাথে বহাস করবে। আব্বা বললেন, ঠিক আছে, তাদেরকে বসতে বলুন। দাদাজান আরও বললেন, যদি তুমি তাদেরকে হারাতে পার, তাহলে তুমি আমার বাড়ীতে থাকতে পারবে, তা না হলে চিরদিনের জন্য আমার বাড়ীর দরজা তোমার জন্য বন্ধ থাকবে। যেই কথা সেই কাজ। গ্রামবাসী এবং মোল্লা মৌলভী আমাদের বাড়ীতে আসল এবং তাঁকে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগল আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তারা যেন আব্বাকে সাহায্য করতে লাগলেন, বিকাল থেকে শুরু করে রাত্রির অর্ধেক হয়ে গেল, তথাপি প্রশ্ন করা শেষ হয় না। হঠাৎ এক মোল্লা আব্বার গালে থাপ্পর মারল, গ্রামবাসীরা এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে বলতে লাগল, মৌলভী সাহেব! এটা কি করলেন, সেতো সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। কে শুনে কার কথা। সাথে সাথেই আর এক মোল্লা আব্বাকে মারার জন্য হাত বাড়ালে আব্বা সহ্য করতে না পেরে মোল্লার গালে জোরে চর মেরে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলেন। পরের দিন গ্রামবাসী এবং মোল্লার দল আমার আব্বার নামে সাতটা মিথ্যা মামলা করল আর যত রকমের অসম্মান করা যায় সবই করল। আমার মা এবং আমাদেরকে দাদাজানের ঘর থেকে খাওয়া বন্ধ করে দিল। নদী থেকে পানি আনা, গোসল করা, অন্যের সাথে কথা বলা, সবই নিষেধ ছিল।

দাদাজানকে বলে দিল আপনার ছেলে আমাদের গ্রামে কোন দিনই আসতে পারবে না। যেখানে পাব, আমরা তাকে হত্যা করব।

আমাদের পরিবার ছিল একান্নভুক্ত। সাত চাচা এবং আমার দাদাদাদি সবারই এক সাথে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মোল্লাদের কথায় দাদা আমাদের ভরণ-পোষণ বন্ধ করে দিল।

তিনদিন অনাহারে থাকার পর আমার মা ভাবলেন, তাঁর বাবা সম্পদশালী, সেখানে গেলে অন্তত নিজে এবং ছেলেমেয়ে খেতে পাবে। মা তাঁর বাবার কাছে (আমার নানার কাছে) খবর পাঠালেন– তাঁকে নেওয়ার জন্য। নানাজান আসলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে তাঁর বাড়ি গেলেন। কয়েক মাস ভালই কাটল, কিন্তু সুখ বেশী দিন সইল না। নানাজানের বাড়ীতেও মোল্লারা আক্রমণ করল। নানাজান রাতে ঘুমাতে পারে না। চিন্তা করে, তাঁর মেয়ের কি হবে। তাঁর আদরের মেয়ের জামাই কাদিয়ানী হয়ে গেছে, এই কথা মনে করে শুধু কাঁদে আর কাঁদে। অন্য দিকে দোযখের ভয়। মোল্লা বলছে কাদিয়ানীদের সাথে সম্পর্ক রাখলে তার স্থান হবে দোযখে। একদিন মোল্লা নানাজানকে বলল, একটা পথ আছে, আপনার মেয়েকে বলুন, সে যেন তার স্বামীকে ডিভোর্স দেয়, তাহলে ব্যাপারটা সহজ হবে। নানাজান আম্মাকে বললেন, মা আমার, তুমি আমার নয়টা বাচ্চার মধ্যে সবচেয়ে আদরের, তোমার কোন দুঃখ আমি সইতে পারি না। তুমি তোমার এ স্বামীকে ডিভোর্স দাও। আমি তোমাকে আমার যা সম্পত্তি আছে তার অর্ধেক লিখে দিব। তোমাকে আমি আবার ভাল ছেলের সাথে বিয়ে দিব। বাবার কথায় মা কষ্ট পান এবং বলেন, "আব্বা, আপনি কি কথা বলছেন! আপনার জামাই তো খুবই ভাল মানুষ, তাকে কোন দিন কোন খারাপ কাজ করতে দেখি নি। কাদিয়ানী হয়েছে তো কি হয়েছে? সেও তো নামায পড়ে, রোযা রাখে। সত্য কথা বলে"।

এই সমস্ত শুনে নানাজান বলছেন, "চিন্তা ভাবনা করে দেখ, আমি সবকিছু হারাতে পারব না। একদিকে সমাজ অন্যদিকে বেহেশ্‌ত"।

মা অস্থির চিন্তায় দোয়া করছেন, "হে খোদা! তুমি আমার জন্য একটা পথ বের করে দাও"। ঐদিনই বিকালে আমাদের এক চাচা আমাদেরকে দেখতে আসলেন। দাদাজান চাচার সাথে আমাদের জন্য কিছু চাল পাঠিয়ে দিলেন। কয়েক দিন পর মোল্লা এবং গ্রামবাসী আবার উৎপাত শুরু করল। এই ভাবে দুই বৎসর কেটে গেল। আব্বা বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর আমাদের আহমদীদের বাড়ীতে থাকতেন এবং মামলা মোকদ্দমায় হাজির হতেন। আমাদের একজন আহমদী উকিল ছিলেন। তিনি আব্বাকে অনেক সাহায্য করেছেন। তিনি মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। হে আল্লাহ্‌! জনাব গোলাম সামদানী সাহেবকে তোমার জান্নাতবাসীদের সাথে স্থান দিও। দুই বৎসর পর আব্বা মামলায় জিতে বাড়ী ফিরলেন। গ্রামবাসী এবং মোল্লা মৌলভী সবাই কোর্টে হাজির হয়ে বন্ড সই দিয়ে লিখিত দিলেন যে, আর কোন দিন আহমদীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বা কাজ করবে না। এরই মধ্যে গ্রামে বড় ধর্মান্ধ মোল্লা মারা গেছে। মোল্লার দৌড় থেমে গেছে। আব্বা গ্রামে এসে জনাব ফকীর সাহেবকে সাথে করে গ্রামবাসীকে আহমদীয়াত সম্বন্ধে বুঝাতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামবাসীরা আহমদীদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা লাভ করল। অনেকে আহমদীও হলো। আমার সাত চাচার চার জনই আহমদী হলেন। এক চাচা দূর্গারামপুরের প্রেসিডেন্ট। আমাদের গ্রামে মাঝে মাঝে জলসা হয়। আহমদী ও গয়ের আহমদী অনেক মানুষ উপস্থিত হয়। আমাদের ভালবাসায় গ্রামের গয়ের আহমদী মানুষও আসে এবং জলসা শুনে ও খাবার দাবার খায়। আল্লাহ্‌র রহমতে এখন আমাদের দূর্গারামপুরের অবস্থা খুবই ভাল।

কয়েক বৎসর পর আমার আব্বা পরিবারসহ ঢাকায় আসেন। ঢাকায় এসে ব্যবসা করা আরম্ভ করেন। আস্তে আস্তে ব্যবসায় উন্নতি হতে থাকে। আল্লাহ্‌র রহমতে আমার আব্বা-আম্মার দোয়ায় আমরা সবদিক দিয়েই ভাল আছি, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

মোহাম্মদ পানাউল্লাহ্‌ সাহেবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে খোদার দিকে টেনে আনা। এইজন্য তিনি সব সময়ই তবলীগ করতে পছন্দ করতেন। অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি তবলীগ করেছেন। তার সাথে আরও ছিল হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর লেখা নযম গেয়ে শুনানোর আগ্রহ। বাংলাদেশের কোন কোন জলসায়ও তিনি নযম গেয়েছেন। আল্লাহ্‌র রহমতে তিনি তিনবার কাদিয়ানের জলসায় উপস্থিত হতে পেরেছেন। কাদিয়ানের জলসায়ও তিনি হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর নযম শোনানোর তৌফিক পেয়েছেন।

আহমদী জামাতকে আব্বা প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। সবসময় আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, "হে আমার আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা-সম্পদ দান করেছ, যা লাভ করার যোগ্যতা আমার ছিল না। সবই তোমার অনুগ্রহ আর সে সম্পদ হলো আহমদীয়াত।

হে আহমদী ভাই ও বোনরা! আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা সবাই দোয়া করবেন, আল্লাহ্‌ যেন পানাউল্লাহ্‌ সাহেবকে ক্ষমা করেন এবং তাঁকে নেক, মু'মিন বান্দাদের সাথে স্থান দেন, আমীন।

মহিষাখোলায় মসজিদ নির্মাণের জন্য নওমুবাঈনদের ঈমান-উদ্দীপক প্রচেষ্টা

মওলানা শোয়েব আহমদ খন্দকার
মুরব্বী সিলসিলাহ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুষ্টিয়ার উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি থানার নাম মিরপুর। সেই মিরপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম মহিষাখোলা। গত ফেব্রুয়ারিতে মহিষাখোলাতে যে মোখালেফাত হয়। মোখালেফাত চলাকালে ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ মহিষাখোলা সফর করেন। স্থানীয় আহমদীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মহিষাখোলাতে মসজিদ এবং মিশন হাউস নির্মাণের উদ্যোগ নিন। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ন্যাশনাল আমীর সাহেব, মহিষাখোলার জমি ক্রয় সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কুষ্টিয়াকে অর্পণ করেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব সেই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন এবং মহিষাখোলাতে সফর করতে থাকেন। ন্যাশনাল আমীর সাহেব পরামর্শ দেন জমি যেন রাস্তার পাশে হয়, সেই অনুযায়ী রাস্তার পাশে থাকা জমি নির্বাচন করা হয়।

গত ২০ শে আগষ্ট ৮ কাঠা জমি আমাদের নামে রেজিষ্ট্রি করার কথা থাকলেও জমির মালিক একসঙ্গে প্রায় ১২ কাঠা জমি ক্রয়ের শর্ত আরোপ করে, যার জন্য বাড়তি প্রায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রয়োজন পরে। স্থানীয় হালকার প্রেসিডেন্ট সাহেব স্থানীয় আহমদী ভাইদের খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। তখন খোকন আহমদ নামের এক আহমদী ভাই বলে উঠেন– "আমরা তো জামা'তের জন্য জীবন দিতেই প্রস্তুত ছিলাম আর এখন, এ তো কেবল মাত্র সামান্য কিছু অর্থ। তিনি আরো বলেন, আমার দুটো গরু আছে যা আমি আসন্ন কুরবানী ঈদে ঢাকায় নিয়ে বিক্রি করবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, (কেননা ঢাকাতে বিক্রি করলে ভালো মূল্য পাওয়া যাবে), কিন্তু এখন যেহেতু জামা'তের নগদ টাকার প্রয়োজন আমি আমার গরু দুটো স্থানীয় বাজারেই বিক্রি করে দেবো, আমার ক্ষতি হলেও সমস্যা নেই, আগে আমাদের জামা'তের জায়গা কেনার জন্য টাকার প্রয়োজন।" তার পাশাপাশি শিপন আহমদ নামের আরেকজন ভাই ঠিক একইভাবে তার গরু বিক্রির টাকা দিয়ে দিতে রাজি হয়ে যান। তার মুখেও একই কথা ছিল। ঠিক তখনই আসাদ আহমদ নামক এক ভাই বলে ওঠেন, "আমার হাতে তো নগদ কোন অর্থকড়ি নেই, আমি আমার যে জমিটুকু এই বছর চাষাবাদ করার জন্য নিয়েছিলাম (অর্থাৎ কট নেয়া) তা অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেব। নতুন আহমদী সদস্য তারা, অথচ আল্লাহ্‌র জামা'তের জন্য এভাবে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করতে দেখে মনের অজান্তেই চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে আসে। আহমদীয়াত মানুষকে কিভাবে বদলে দেয় এর বাস্তব উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে। তাদের কুরবানীর নমুনা, বার বার রসূলে করীম (সা.)-এর জামানাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। এক আহমদীর মা এসে জানালেন যে, তিনি ৮০ হাজার টাকা দিতে রাজী আছেন। অথচ খাকসার খুব ভালভাবেই অবগত যে, এই মা তার ছোট মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তিল তিল করে জমানো অর্থ আজ জামা'তের জায়গা কেনার জন্য পেশ করছেন। তাদের এই ত্যাগ দেখে মন থেকেই উচ্চারিত হয়– "আল্লাহু আকবার"।

যাই হোক, অবশেষে আমাদের পক্ষ থেকে জমির মালিককে ইতিবাচক সংবাদ জানানো হলে জমির মালিক তখন বলে বসে যে, "সে জমি বিক্রি করবে না"। গ্রামের সর্দাররা পাছে কি বলে এই ভয়ে সে পিছপা হয়েছে বলে জমির মধ্যস্ততাকারী আমাদেরকে অবহিত করে। স্থানীয় আহমদীদের মন ভেঙ্গে যায়। খাকসার সকলকে একত্রিত করে কিছু নসিহত প্রদান করি ও বলি "আপনারা দোয়ার ওপর জোর দিন, কেননা দুনিয়াবী যত চেষ্টা-প্রচেষ্টা রয়েছে আমরা তা করেছি, এখন একমাত্র অদৃশ্য হাতের ছোয়া (খোদার সাহায্য) ছাড়া আমাদের পক্ষে জমি লাভ করা সম্ভব নয়।" আমরা অত্যন্ত বেদনা ভরা হৃদয় নিয়ে সন্ধ্যার পর কুষ্টিয়ায় ফিরে আসি। স্থানীয় আহমদীরা সকলেই দোয়ায় রত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সত্য জামা'তকে বার বার সাহায্য করেন তার প্রমাণ একদিন পরেই আমরা হাতে-নাতে পাই। পরদিন শনিবার সন্ধ্যায় জমির মালিক তার জমি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে শর্ত জুড়ে দিয়ে বলে যে, জমি নিতে চাইলে আগামীকালই (অর্থাৎ রবিবার) অর্থ পরিশোধ করে জমি রেজিষ্ট্রি করে নিতে হবে। কেননা দেরি হলে বিষয়টি গোপন নাও থাকতে পারে

আর বিরোধীরা বাঁধাও সৃষ্টি করতে পারে। রাত ৯ টার সময় সে এই কথা জানালে পরদিন ফজরের পর খাকসার ও প্রেসিডেন্ট সাহেব (কুষ্টিয়া) মহিষাখোলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সেখানে পৌঁছানোর পর স্থানীয় আহমদীদের সাথে আলাপচারিতায় জানলাম যে– "জমির মালিককে জমি ক্রয় বাবদ নগদ অর্থ দিতে হবে" যেহেতু নগদ অর্থ এত কম সময়ে কারো কাছেই নেই তারপরও এক দুইজন এগিয়ে এলেন। ঐ মা, যিনি তার মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা রেখেছিলেন তিনি তার সেই টাকা প্রদান করেন। আরেক ভাই তার জমি, যা তিনি কট নিয়েছিলেন তা অন্যের নিকট রেখে টাকা যোগাড় করে নিয়ে আসেন। আর বাকি থাকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। শিপন আহমদ আর আসাদ আহমদ নামে আমাদের দুই ভাই তাদের নিজস্ব কট নেয়া চাষের জমি, জমির মালিককে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বাবদ দিয়ে দিতে চায়। খাকসার তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ধানের জমি দিয়ে দিলে এই বছর আপনারা খাবেন কি? জবাবে তারা বলেন যে, "রিযক-এর মালিক আল্লাহ্" এই বছর না হয় মানুষের বাড়ি বাড়ি দিন মজুরী করে কাটিয়ে দেব, হযরত আবু বকর (রা.) তো উনুনের লাকড়ি পর্যন্ত খোদার রসূলের ডাকে নিয়ে আসছিলেন, প্রয়োজনে আমরাও তাই করব নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও জামা'তের জন্য জমি ক্রয় আমরা করব" নওমুবাঈন ভাইদের মুখে এরকম কথা শুনে হৃদয়ে শিহরণ জাগে। যাই হোক, কট নেয়া জমির মালিকের কাছে যাওয়া হলে বলে, আগামী চৈত্রের শুরুতে তাকে টাকা দিয়ে দিলে সেই জমি তাদেরকে পুনরায় ফেরত দিয়ে দিবে। অতঃপর আমীর সাহেব এর অনুমতিক্রমে আমরা ২০ আগষ্ট রবিবার জমি রেজিষ্ট্রির কাজ সম্পন্ন করি। আল্লাহ্‌র রহমতে আমাদের নতুন আহমদী ভাইয়েরা অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে এবং জমি রেজিষ্ট্রি করার পর বার বার তারা খোদা তা'লার নিকট শুকরিয়া আদায় করেন। জমিতে বর্তমানে পিলার বসানোর কাজ চলছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই ভাইদের কুরবানী কবুল করুন। মহিষাখোলার এই জমি ক্রয়ে যিনি নীরব সেবা দান করেন তিনি হলেন কুষ্টিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট শহিদ উদ্দিন আহমদ। তিনি তার অসুস্থ, মৃত্যু পথযাত্রী স্ত্রীকে রেখে, দিনের পর দিন ছুটছেন জমি সংক্রান্ত বিষয়টি সমাধান করতে। তার স্ত্রীকে হাসপাতালে রেখে তিনি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার স্ত্রীকে পূর্ণ আরোগ্য দান করুন আর এই কুরবানীকে গ্রহণ করুন এবং এর উত্তম প্রতিদান দিন। পাশাপাশি মহিষাখোলা হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব ফরিদ আহমদ এই জমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সেবাও গ্রহণ করুন আর এর উত্তম প্রতিদান দিন। সর্বোপরি যারা যারা মহিষাখোলার জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ্ তা'লা সবার পরিশ্রম ও কুরবানীকে গ্রহণ করুন। আর মহিষাখোলাতে আহমদীয়াতের একটি সবুজ সতেজ ফলদায়ী বাগান দান করুন, আমীন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা অবগত আছেন, বছরের প্রথমেই হুযূর (আই.) সকল আহমদীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, জামাতের কেউই যাতে তাহরীক-ই-জাদীদ চাঁদার বাইরে না থাকেন। মনে রাখবেন, নবজাতক থেকে বৃদ্ধ কাউকেই এর ফজিলত থেকে বঞ্চিত করবেন না। নওমোবাইনদেরও একই ভাবে শরীক করুন। মৃত পিতা-মাতা, দাদা দাদী বা নিকটাত্মীয়-স্বজনের নামে এই চাঁদা দিয়ে তাদেরকেও জীবিত রাখার নির্দেশনা রয়েছে। চাঁদা যে কোন পরিমাণই হোক না কেন প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে।

আপনাদের সকলের নিকট বিনীত আবেদন, অক্টোবর মাসের ৩১ তারিখে এই তাহরীকে জদীদের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর শেষ হতে চলেছে। অতএব আপনারা অতিসত্ত্বর চাঁদা আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং **অক্টোবর মাসের প্রথম দশ দিন চাঁদা আদায়ের জন্য আশারা পালন করুন।** জামাতের সাথে যাদের যোগাযোগ তেমন একটা নেই তাদের নিকটও খলীফার এই পয়গাম পৌঁছান এবং তাদেরকে এই চাঁদার অন্তর্ভুক্ত করুন (চাঁদা যত টাকাই দিন না কেন)। এ ব্যাপারে জামাতের সকল অঙ্গ সংগঠন ও মুরুব্বী মোয়াল্লেমদের সহযোগিতা গ্রহণ করুন।

চাঁদা আদায়ের রিপোর্ট আগামী ২০ অক্টোবর ২০১৭ইং তারিখের মধ্যে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে প্রেরণ করুন, যাতে যথা সময়ে হুযূর (আই.) এর দপ্তরে রিপোর্ট প্রেরণ করা যায়। আমাদের এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন আমরা যুগ খলীফার প্রত্যেকটি নির্দেশ পালনে স্বচেষ্ট হই এবং হুযূরের দোয়া ও বরকতের অংশীদার হই।

শহীদুল ইসলাম
সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
প্রয়োজনে : ০১৭১৪০৮৫০৭০/০১৭৩০০২৮৫৭৬

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

লাকী আহমদ, তেবাড়িয়া

"পুরুষ বা নারী, যে কেউ মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করবে, আমরা নিশ্চয়ই তাকে এক পবিত্র জীবন দান করবো আর আমরা তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদান অবশ্যই তাদের দিব"। (সূরা আন্ নাহল ঃ ৯৮)। এই আয়াতে পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং উভয়ের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতের সমান অংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আমাদের বর্তমান খলীফা (আই.) যুক্তরাজ্যের ৪০তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, একজন আহমদী মুসলিম মহিলা আল্লাহ্‌র কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কেননা, তিনি তাকে হয় আহমদী পরিবারে জন্ম দিয়েছেন অথবা সত্য গ্রহণ করার (আহমদী হবার) সৌভাগ্য দান করেছেন। এ ঐশী অনুগ্রহের জন্য সে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক, তা কম হবে।

এই জামাতে এসে এ যুগের ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত ও খাঁটি শিক্ষা সে লাভ করেছে। কুরআনের খাঁটি শিক্ষা বাস্তবায়নে এ জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা জামাতের প্রতিটি সদস্যের প্রতি নিজ স্ত্রীকে তার যথাযথ অধিকার প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্ত্রীকে সম্মান করতে ও তার সাথে নম্রতা ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। একবার স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ইলহাম করে তাঁর এক বিশিষ্ট সাহাবীকে (যিনি নেকী ও তাক্ওয়ার উচ্চ স্তরে উন্নীত ছিলেন) নিজ স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন।

লক্ষ্য করুন, যার সম্বন্ধে এই ইলহাম হয়েছে, তিনি কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিশিষ্ট সহযোগী এবং এক বড় মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে সতর্ক করেছেন। যে মানুষটির ওপর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে মানুষটির সাথে বিনা কারণে অন্যায় আচরণ আল্লাহ্ তা'লা সহ্য করেন না। সেই স্ত্রীকে তুচ্ছ জ্ঞান করাও আল্লাহ্ সহ্য করেন না। বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল স্ত্রীর প্রতি বিনা কারণে অন্যায় আচরণ আল্লাহ্ সহ্য করেন না। তাই এ কাজ করতে তাকে নিষেধ করে বলেছেন, তাকে বুঝাও। এ ধরনের পবিত্র স্ত্রীর সাথে সম্মান ও মর্যাদার আচরণ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম হয়েছিল– "এই আচরণ সঠিক নয়"।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "এই ইলহামের মাঝে গোটা জামাতের জন্য শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। তারা যেন নিজ স্ত্রীদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ ও বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করে। এরা তাদের দাসী নয়।' (তোহফায়ে গোলড়বীয়া. পৃ: ৩৭ পরিশিষ্ট) আরেক স্থলে এক ধরনের অত্যাচারী স্বামীদের কথা উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "তারা (স্ত্রীদের প্রতি) এমন কঠোরতা ও কড়াকড়ি আরোপ করে, যেন এদের সাথে জীবজন্তুর কোন তফাতই নেই। এদের প্রতি দাসী ও জীবজন্তুর চেয়েও খারাপ আচরণ করা হয়ে থাকে। তারা এদেরকে এমন ভাবে প্রহার করে যে, বুঝাই যায় না তাদের সম্মুখে কোন জীবিত প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে, নাকি অন্য কিছু! মোটকথা, তাদের সাথে বড় নিকৃষ্ট আচরণ করে থাকে... এটা গুরুতর একটা বিষয় এবং ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী, (মলফুজাত, ৪র্থ খন্ড পৃ: ৪৪)।

পুরুষদেরকে উপদেশ দিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন, "একথা ভেবো না, স্ত্রী এমন জিনিস যাকে নিতান্তই তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত গণ্য করা যায়। কক্ষণো না!" আমাদের পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'খায়রুকুম খায়রুকুম লি আহলেহি' অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সে, যে নিজ স্ত্রীর সাথে উৎকৃষ্ট আচরণ করে"। স্ত্রীর সাথে যার আচরণ ও ব্যবহার ভাল নয়, সে পুণ্যবান হয় কি করে! অন্যদের সাথে মানুষ কেবল তখনই নেকী ও ভাল আচরণ করতে পারে, যখন সে নিজ স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করবে আর উৎকৃষ্ট ভাবে বসবাস করবে। (মলফুজাত, ২য় খন্ড, পৃ: ১৪৭)

এই হল ইসলামী স্বর্ণ-শিক্ষার এক ঝলক, যা এ যুগে হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে পুনরায় তুলে ধরেছেন। ইসলামী এই সুন্দর শিক্ষার বাস্তব রূপায়ন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে ঘটেছিল আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে। কিন্তু যুগের বিবর্তনে অন্যান্য ইসলামী-শিক্ষা মানুষ যেমন ভুলে গেছে, তেমনি এই শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিথিলতা দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ, স্ত্রীদের

অধিকার প্রদান, তাদের সাথে নম্র, সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের শিক্ষা মানুষ ভুলে যেতে বসেছে।

একজন পুণ্যবতী ও সৎকর্মশীলা স্ত্রী এক মহা উচ্চমর্যাদার অধিকারী আর তা হল, তার পায়ের তলে সন্তানের বেহেশ্‌ত। যেহেতু যুগের বিবর্তনের সাথে মহিলাদের মর্যাদা সংরক্ষণের বিষয়ে শিথিলতা দেখা দিয়েছে, তাই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এদিকে পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছেন, "স্ত্রীদের অধিকার যেন নিশ্চিত করা হয়"।

মহিলাদেরকে মহানবী (সা.) কাঁচের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ তার সাথে কঠোরতামূলক আচরণ তার মন ভেঙ্গে চৌচির করে দিতে পারে। তার দৈহিক গঠন বলুন আর তার সুক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতিই বলুন, তাকে এমন ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার দরুন তার প্রতি নম্রতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ আবশ্যক।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, "নারীদেরকে পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হাড়ের মধ্যে সর্বপেক্ষা বাঁকা হাড় হলো উপরেরটা (আর তা হতেই নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে)। অতএব তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও তবে, ভেঙ্গে ফেলবে আর যদি ফেলে রাখ তবে সর্বদা বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, স্ত্রীলোক যখন তার জন্য নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযান মাসে রোযা রাখবে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে ও স্বামীর অনুগত থাকবে, তখন সে বেহেশ্‌তের যে দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে চাইবে, করতে পারবে।" (মেশকাত)

ইসলাম যেরূপ নারীর অধিকার সংরক্ষণ করে, অন্যকোন ধর্ম সেরূপ করেনি। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা হয়েছে, "উয়ালাহুম্মা মিসলুহুল্লাযী আলায় হিন্না" স্ত্রীলোকদের পুরুষদের উপর সেরূপ অধিকার আছে, যেরূপ পুরুষদের আছে নারীদের ওপর।

মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "কোন কোন লোক তাদের স্ত্রীদেরকে নিজেদের জুতার সমতুল্য মনে করে এবং তাদের দ্বারা খুবই নোংরা কাজ করায়। তারা তাদেরকে গালিগালাজ করে এবং খুবই হেয় চোখে দেখে। তারা তাদের পর্দার নির্দেশাবলী এরূপ বিধি-বহির্ভূত ভাবে চাপায়, যা তাদের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী রাখার তুল্য। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন সম্পর্ক হবে, যেন তারা পরস্পর প্রকৃত বিশ্বস্ত বন্ধু।.....যদি পুরুষরা তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার না করে, তবে তারা আল্লাহ্‌র সাথে কীভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে"? (মলফুযাত, ৫ম খন্ড)

সম্পদে নারীদের অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "পুরুষদের জন্য তাতে অংশ রয়েছে যা পিতামাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছেড়ে যায় এবং নারীদের জন্যও এতে অংশ রয়েছে, যা পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়গণ ছেড়ে যায়। অল্প হলেও অথবা বেশী হলেও এর নির্ধারিত একটি অংশ"। (৪:৮)

এই আয়াতটি ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তি। এটা পুরুষ ও স্ত্রলোকের সামাজিক সমমর্যাদার সাধারণ নীতি ঘোষণা করেছে। উভয়েই সম্পত্তির যথাযোগ্য অংশ উত্তরাধিকাররূপে পাওয়ার অধিকার রাখে।

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে, হে যারা ঈমান এনেছ! এটা তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীগণের উত্তরাধিকারী হয়ে যাও। (সূরা আন নিসা ঃ ২০)

তালাকপ্রাপ্তা নারীদের অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করতে হবে। এটা মুত্তাকীগণের জন্য বাধ্যকর"। (সূরা বাকারা ঃ ২৪২)

কন্যা সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "অথচ যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান (জন্মের) সংবাদ দেওয়া হয় তখন দুঃখে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায়। এবং সে তার মনঃকষ্ট চেপে রাখে"। (সূরা আন নাহল : ৫৯)

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে যে, যার সম্পর্কে তাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে, এর কষ্টে সে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়ায় আর ভাবে লাঞ্ছনার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তাকে কি সে বাঁচিয়ে রাখবে, নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? সাবধান তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা অতি জঘন্য। (সূরা আন নাহল ঃ ৬০)

এই আয়াতে আরবের কোন কোন উপজাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলা হত... এই সমস্ত ঘটনা সেই পৈশাচিক, বর্বর ও অমানুষিক প্রথার প্রতি ইঙ্গত করছে। তারা, অর্থাৎ আরবরা তাদের নারীগোষ্ঠীর প্রতি অত্যন্ত নীচ ধারণা পোষণ করত ও নারীদেরকে চরম নিম্নস্তরে স্থান দিত। কুরআন করীম নারীর সম্মানজনক মর্যাদাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে এবং তাদের সকল ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। এই বিষয়েও পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআন অদ্বিতীয় ও অনুপম।

সবশেষে একটি হাদীস উল্লেখ করে আমি আমার লেখার সমাপ্তি টানব–

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যার একটি কন্যা বা বোন আছে আর সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং তাকে তুচ্ছও মনে করেনি, আর তার পুত্র-সন্তানকে প্রাধান্য দেয় নি, আল্লাহ্ তা'লা তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবেন। (মেশকাত মূল: আবু দাউদ)

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে বুঝার তৌফিক আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে দান করুন, আমীন।

সংবাদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর-এর উদ্যোগে ৩য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

ফাজিলপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ১৪/০৮/২০১৭ তারিখ স্থানীয় বার্ষিক ৩য় তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সকাল ১০.৩০ মিনিটে ১ম অধিবেশন শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠনের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা প্রেসিডেন্ট মোস্তারিন আক্তার। কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

এরপর আহাদনামা, হাদীস ও অমৃতবাণী পাঠ এবং উর্দূ বাংলা নযম এবং মালী কুরবানীর ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন। সিলেবাসের ১০টি তালিমী বিষয়ের ওপর কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খাওয়া-দাওয়া ও নামাযের বিরতির পর ৩:৩০ মি: ২য় অধিবেশন শুরু হয়।

অধিবেশনের শুরুতে লাজনা ও নাসেরাতের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবার মূল্যবান বক্তৃতার পর দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিল।

ফারহানা রেজওয়ানা

ঈদুল আযহা উপলক্ষে "ঈদ পুনর্মিলন" অনুষ্ঠান উদযাপন

গত ০৮/০৯/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত সিলেট সদর এর উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসায় পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে "ঈদ পুনর্মিলন" অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম ও আঞ্চলিক তবলীগি আহবায়ক সিলেট অঞ্চল। অনুষ্ঠানে প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব ফাহিম ইকবাল এবং বাংলা নযম পেশ করেন কবির আহমদ চৌধুরী। কে কিভাবে ঈদ উদযাপন করেন এবং ঈদ আমাদের কি শিক্ষা দেয় তা বর্ণনা করেন সর্বজনাব গোলাম গাউস চৌধরী, জনাব আব্দুল বাতেন, জনাব ফরিদ উদ্দিন, জনাব ফাহিম ইকবাল ও প্রধান অতিথি মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন প্রমূখ। সবশেষে কুরবানীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সমাপনী ভাষণ প্রদান করে। পরিশেষে খাকসার ইজতেমায়ী দোয়া পড়াই।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় জানাচ্ছি যে, আমার প্রিয় আম্মা রেজিয়া বেগম, স্বামী মরহুম আবদুল খালেক গত ২৫/০৭/২০১৭ ইং, মঙ্গলবার, বিকাল সাড়ে চার টায় উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, উত্তরা, ঢাকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। তিনি দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর। তাঁর প্রথম জানাযা আশকোনা হালকার নিজ বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে গ্রামের বাড়ী দূর্গারামপুর নিয়ে পরের দিন সকাল ৮ টায় দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং দূর্গারামপুর কবরস্থানে সমাহীত করা হয়।

গত ২৮/০৭/২০১৭ বাদ জুমুআ আশকোনা হালকার নিজ বাসভবনে মরহুমার উদ্দেশ্যে এক যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আশকোনা হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব তোফাজ্জল হোসেন সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সাবাহউদ্দিন সালমুন। মরহুমার যিকরে খায়ের করেন জনাব আব্দুস সালাম সাহেব ও মরহুমার বড় ছেলে জনাব বশীরউদ্দীন আহমদ এবং জনাব তোফাজ্জল হোসেন সাহেব। এ ছাড়া মোয়াল্লেম এনামুল হক রনি সাহেব যিকরে খায়ের ও নসিহত করেন। পরে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা হয়। এতে প্রায় ১৭০ জন আহমদী ও গায়ের আহমদী উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যুকালে মরহুমা ৩ ছেলে , ৩ মেয়ে, বহু নাতী-নাতনী ও শোকসন্তপ্ত পরিবার রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ তা'লা যেন মরহুমাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মাকাম দান করেন তার জন্য মরহুমার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের পক্ষ থেকে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমার বড় ছেলে বশীরউদ্দীন আহমদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম

আন্তর্জতিক সালানা জলসা, ইউ.কে. দেখার প্রতিবেদন

গত ২৮-৩০ জুলাই, ২০১৭ পর্যন্ত ইউ.কে. জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় ঢাকার বিভিন্ন হালকায় প্রতিদিনের আনসার সদস্যগণের উপস্থিতি নিম্নরূপ:

নং.	হালকা	মোট	জেরে তবলীগ	নও মোবাইন
১.	দারুত তবলীগ	১৯০	৬৫	২৬
২.	আজিমপুর	৪১	০৭	০৫
৩.	ধানমন্ডি	৪৪	০৬	০২
৪.	মোহাম্মদপুর	২৬	১৫	০৬
৫.	মাদারটেক	৫৩	৩২	১৫
৬.	মতিঝিল	৭৫	০৫	০৩
৭.	শান্তিনগর	৮০	০৮	০৭
৮.	মহাখালী	৩৬	০৫	০৩
৯.	পলাশপুর	৩১	১২	০২
১০.	আশকোনা	৬৫	১১	০৭
১১.	উত্তরা	২৮	০৯	০৪
১২.	নাখালপাড়া	২১	০৩	০৫
	মোট:	৬৯০	১৭৮	৮৫

শুক্রবার পবিত্র কুরআন ক্লাসের প্রতিবেদন

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে প্রতি শুক্রবার দারুত্ তবলীগের নতুন বিল্ডিংয়ের ২য় তলায় শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠের ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উক্ত ক্লাসে আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল সকলেই অংশগ্রহণ করে থাকে। আমাদের এই কুরআন ক্লাসের জন্য সকলের নিকট দোয়া কামনা করছি।

ষান্মাসিক পর্যালোচনা সভা

বিগত ১৪ জুলাই, ২০১৭ শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার অফিসে সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ষান্মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সভায় বিগত ৬ মাসের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও আগামী ৬ মাসের পরিকল্পনা নিয়ে আমেলা সদস্যগণ আলোচনা করেন। কেন্দ্র থেকে সদর সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নঈম আলম খান, কায়েদ উমুমী, ম.আ. বাংলাদেশ। তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার বিভিন্ন কার্যক্রম কিভাবে হচ্ছে ও কিভাবে করা উচিত এবং আহমদী হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব কতটুকু পালন করছি, এ বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ করা হয়।

জুলাই মাসের তরবীয়তী কার্যক্রমের প্রতিবেদন

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার ২ টি এমটিএ ডিস সংযোগ ও একটি রিসিভার প্রদান করা হয়। এছাড়াও সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সকল হালকার আনসার সদস্যদেরকে এসএমএস ও ফোনের মাধ্যমে জানানো হয়।

জুলাই মাসের ঈসার বিভাগের রিপোর্ট

গত জুলাই মাসে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার ঈসার বিভাগ বিভিন্ন হালকায় প্রায় ১০০ টি পরিবারের ভিতরে চিকুনগুনিয়ার হোমিও ঔষুধ বিতরণ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এছাড়াও ৪ জন গরীব আহমদীকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও বেশকিছু অসুস্থ্য রোগীর খোঁজ-খবর নেওয়া হয়েছে।

জুলাই মাসের তালীমি কার্যক্রমের প্রতিবেদন

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের বাৎসরিক কর্ম-ক্যালেন্ডার ২০১৭ বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে জুলাই মাসের তালীমি কার্যক্রমের মধ্যে সূরা নিসার ৭০ নম্বর আয়াত এবং চল্লিশটি মহামূল্যবান রত্ন থেকে ২৩ নং হাদীস অর্থসহ মুখস্ত এবং "নিশানে আসমানী" পুস্তক পাঠ করার উদ্দেশ্যে একটি লিফলেট ঢাকার প্রত্যেক আনসার ভাইর নিকট পৌঁছানো হয়েছে।

এছাড়াও কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তালিমী প্রশ্নপত্রের ফটোকপি আনসার ভাইদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

শফিকুল হাকিম আহমদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪৬তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪৬তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ইং রোজ শুক্রবার সকাল ৮.৩০ মিনিটে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গনে। প্রচণ্ড বৃষ্টি উপেক্ষা করেও দেশের দূর-দূরান্ত হতে ৯৬টি মজলিস থেকে প্রায় ৮০০ খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য এবং প্রায় ৪০০ আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৮.৩০ মিনিটে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা উত্তোলনপর্ব শেষে উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং নযম পাঠের পর ইজতেমা উপলক্ষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য প্রদান করেন যা ইজতেমায় আগত সকল সদস্যগণকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি শৃংখলা, প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী সব খোদ্দাম ও আতফালবৃন্দকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রকৃত শিক্ষা নিষ্ঠার সাথে পালন করার আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অধিবেশনে আরো বক্তৃতা করেন জনাব শাহানশাহ আজাদ জুম্মন। এছাড়া সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ ইজতেমা উপলক্ষে আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি হয়। এরপর ইজতেমার বিভিন্ন কার্যক্রম চলতে থাকে। ১লা অক্টোর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নসীহত মূলত ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিন শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় মজলিস আতফালুল আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে ইজতেমা উপলক্ষ্যে আগত সকল আতফালদের নিয়ে আতফাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব মুনাদিল ফাহাদ, নায়েব সদর-২। তারুয়া মজলিসের আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য ইশতিয়াক আহমদ প্রিতম এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আতফাল সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। নযম পাঠ করেন ঘাটুরা মজলিসের আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য তুষার আহমদ। সম্মেলনে আতফালদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তৃতা রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, বাংলাডেস্ক, ঢাকা। তিনি আতফালদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ইসলাম ও রসূলের শিক্ষা ও আদর্শ জীবন বিপন্ন অবস্থাতেও প্রতিপালন করা এবং রসূল তথা রসূল (সা.)-এর অবর্তমানে খিলাফতের প্রতি পরম ভালোবাসা রাখা। এছাড়া তিনি আতফালদেরকে নিয়মিত পবিত্র কুরআন চর্চা, নিয়মিত পাঁচওয়াক্ত বাজামাত নামায আদায় ও খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আতফাল সম্মেলনের এ পর্যায়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, মোহতরম সদর সাহেব এবং ইউকে থেকে আগত এমটিএ-এর উপস্থাপক ও কর্মী জনাব গালীব। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব একজন আহমদী শিশুর জীবন কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রাণচঞ্চল ভাষায় বক্তব্য রাখেন। মোহতরম সদর সাহেবও নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন। এছাড়া মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের মোহতামীম আতফাল সাহেব আতফালদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা করেন।

আতফাল সম্মেলনে প্রায় ৪শতাধিক আতফাল উপস্থিত ছিলেন। সকল আতফালকে টিশার্ট দেয়া হয়। শেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব কৃতি ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

ইজতেমায় অন্যান্য অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ইজতেমার দ্বিতীয় দিন শনিবার সকাল ১১ ঘটিকায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী কক্ষে লেখক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এতে সভাপতিত্ব করেন মজলিস খোদ্দামুল আহদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মাহমুদ আহমদ বিপ্লব। এছাড়া ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন, 'সুলতানুল কালাম' সংগঠনের পরিচালক জনাব শিহাম জোহেব বাপী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব মুনাদিল ফাহাদ, নায়েব সদর ২, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন স্থানের খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত লেখক সমাবেশে লেখালেখি বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বক্তৃতা রাখেন জাতীয় পত্রিকার কলামিস্ট জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন: বর্তমান যুগ হচ্ছে কলমের জিহাদের যুগ। আজকে আমাদেরকে কলমের মাধ্যমে জিহাদ করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে যারা আপত্তি করে তাদেরকে লেখনীর মাধ্যমে আমাদেরকে জবাব দিতে হবে। এছাড়া আমরা যাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) হিসেবে মেনেছি তাঁকে আল্লাহতায়ালা এ যুগের লেখনী সম্রাট আখ্যায়ীত করেছেন। তাই আমরা তাঁর সৈনিক হয়ে তাঁর কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কলম হাতে নিতে হবে। তিনি তার বক্তৃতায় আরো বলেন: আমরা যদি প্রকৃত ইসলামকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরি তাহলেই বিশ্বে শান্তি ফিরে আসতে পারে। এরপর বক্তৃতা রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। বর্তমান যুগে যে লেখা লেখির গুরুত্ব অতি ব্যাপক এ বিষয়টি তিনি তার বক্তৃতায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন।

তিনি বলেন: প্রিন্ট মিডিয়া বা সোসাল মিডিয়া যে মাধ্যমই হোক না কেন আমাদেরকে জামা'তের প্রচার করতে হবে। আমরা জানি, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে তিনি কীভাবে বিরুদ্ধবাদীদেরকে লেখনীর মাধ্যমে দাঁতভাঙা জবাব দিতেন। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে 'আনসারে সুলতানুল কালাম' সংগঠনের পরিচালক জনাব শিহাম জোহেব বাপী উপস্থিত শ্রোতাদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মাহমুদ আহমদ বিপ্লব, সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ মূল্যবান নসীহতমূলক বক্তৃতা রাখেন এবং শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে লেখক সমাবেশের সফল সমাপ্তি হয়। এবারই প্রথম ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ হয়।

আবুল আতা মামুন
সেক্রেটারী, ইজতেমা কমিটি

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকার উদ্যোগে খেদমত-ই খালক্ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় মেডিকেল এবং স্বাস্থ্যসেবা মেলা'২০১৭ অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকার উদ্যোগে খেদমত-ই খালক্ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১ম বারের মতো বকশীবাজারস্থ দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হলো মেডিকেল এবং স্বাস্থ্যসেবা মেলা'২০১৭।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর'২০১৭, শুক্রবার দিনব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ)। উদ্বোধনী বক্তৃতা শেষে তিনি সকল বুথ পরিদর্শন করেন এবং বাদ জুমুআ মেলা সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

এ সময় মেডিকেল এবং স্বাস্থ্যসেবা মেলা'২০১৭ পরিদর্শন করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ডা. শরীফ আহমেদ কাওকাব এবং পরিদর্শন শেষে মেলা প্রাঙ্গনে রাখা পরিদর্শন ফরমে লিখিত মন্তব্য প্রদান করেন।

পরিদর্শনকালে ফ্রি কনসালট্যান্সী বুথ-এ ডা. শরীফ আহমেদ কাওকাব মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান এবং মেলায় অংশ নেয়া চিকিৎসকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

উল্লেখ্য যে, ১ম বারের মতো এই আয়োজনে এলোপ্যথিক, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, ডেন্টাল, ব্লাড গ্রুপিং, উচ্চতা ও ওজন নির্ণয়, ডায়াবেটিস পরীক্ষাসহ ১৮টি স্বাস্থ্যসেবা বুথ থেকে ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

এ ধরনের মেলায় আয়োজনকে উপস্থিত সকলেই স্বাগত জানিয়েছেন। আশা করি ভবিষ্যতে বৃহত্তর পরিসরে এ ধরনের মেলার আয়োজনে সকলেই আরো উপকৃত হবেন।

কৃতি-ছাত্রী

চট্টগ্রাম আহমদিয়া মুসলিম জামাত এর সদস্যা **কানিজ মাহাজাবিন যুথী,** পিতা- এস. এম. মাহামুদ জামান, মাতা- নাছরীন আহমেদ চৌধুরী ২০১৭ ইং সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় জি.পি.এ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, সে মরহুম বজলুর রহমান সাহেবের ছেলের ঘরের নাতনী এবং আবদুল গফুর চৌধুরীর মেয়ের ঘরের নাতনী। তার শারীরিক, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার মাধ্যমে সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী।

খালিদ আহমেদ সিরাজি

* শুভ বিবাহ *

গত ১২/০৫/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ শানজিদা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ মোজাফ্‌ফর সানা, গ্রামঃ বতুল বাজার, পোঃ উত্তর বেদকাশী, থানাঃ কয়রা, জেলাঃ খুলনা এর সাথে মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ শাজাহান গাজী, গ্রাম+পোঃ দক্ষিণ ঘুগরাকাটী, থানাঃ কয়রা, জেলাঃ খুলনা-এর বিবাহ ৬০,০০১/- (ষাট হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪২৬/১৭

গত ০৭/০৭/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ জলি খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ খয়বর প্রাং, গ্রাম+ জোড়গাছা, থানাঃ সারিয়াকান্দি জেলাঃ বগুড়া এর সাথে শরীফ আহমেদ, পিতা- সাখায়াৎ হোসেন মন্ডল, নিউসোনাতলা, বগুড়া এর বিবাহ ১,৪৪,০০০/- (এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪২৭/১৭

গত ৩০/০৬/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ নাদিয়া তাহের উর্মি, পিতা- মোহাম্মদ আবু তাহের, গ্রামঃ দক্ষিণ সস্তাপুর, থানাঃ ও জেলাঃ ফতুল্লা এর সাথে ওমর আহমদ ঢালী, পিতাঃ আকবর হোসেন ঢালী, খানপুর ব্রাঞ্চ রোড, নারায়ণগঞ্জ এর বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুই লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪২৮/১৭

গত ০৭/০৭/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ খাদিজা আক্তার, পিতাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম, গ্রাম চারিপাড়া, থানাঃ কটিয়াদি, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ এর সাথে মোহাম্মদ মুছা মোড়ল, পিতা- মোহাম্মদ মতিয়ার মোড়ল, গ্রামঃ মীরগাং, পোঃ যতীন্দ্রনগর, থানাঃ শ্যামনগর, জেলাঃ সাতক্ষীরা এর বিবাহ ১, ৫০, ০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪২৯/১৭

গত ১২/০৫/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ সুমী, পিতাঃ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ আহমদনগর, পোঃ ধাক্কামারা, থানা+জেলা পঞ্চগড় এর সাথে মোহাম্মদ রায়হান আলী, পিতাঃ মোহাম্মদ হানিফ আলী, গ্রামঃ নিশ্চিন্তপুর পোঃ শেমপুরা, থানাঃ+জেলা দিনাজপুর এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৩০/১৭

গত ১৪/০৭/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ তামান্না আহমেদ, পিতা ঃ মরহুম মোহাম্মদ রশিদ আহমেদ, গ্রামঃ বাশারুক পোষ্ট পাক হাজীরপুর, থানাঃ নবীনগর জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে মোহাম্মদ মোবাশ্বেরুল হক, পিতা- মোহাম্মদ আহসানউল্লাহ, হাউজ নং-৩০, ব্লক-এইচ সেকশন-২ রোড নং-৭ মিরপুর, ঢাকা এর বিবাহ ৩,০০,০০১/- (তিনলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৩১/১৭

গত ০৪/০৬/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ জেনি বেগম, পিতাঃ মোহাম্মদ আহমদ মিয়া, সিমরাইল, কান্দিপাড়া, হাউজ রোড, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর সাথে মোহাম্মদ সালাউদ্দীন, পিতা- মোহাম্মদ আল আমিন, ৬/২, সি, বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা এর বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুই লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৩২/১৭

গত ১৯/০৪/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ ইশরাত জাহান (ঝর্না), পিতাঃ মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, গ্রামঃ+পোষ্ট পাঁচ পুরুলিয়া, থানাঃ গুরুদাসপুর, জেলাঃ নাটোর এর সাথে মোহাম্মদ আনোয়ার আলী ইমরান, পিতাঃ মোবারক আলী, আফ্রাদ, গ্রামঃ আহমদনগর, পোষ্টঃ ধাক্কামারা, থানাঃ বোদা, জেলা-পঞ্চগড় এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৩৩/১৭

গত ২৭/০৮/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ মুক্তা আক্তার, পিতা ঃ মোহাম্মদ ধন মিয়া, ভাদুঘর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর সাথে সোহেল আহমদ, পিতাঃ মরহুম মোহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর বিবাহ ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ্য পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৩৪/১৭

গত ১০/০৮/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ তানিয়া বেগম, পিতাঃ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে মোহাম্মদ সিকদার নাছের আহমদ, পিতাঃ এস, এম, আনোয়ার উল্লাহ্, আই ১২০/৫ উত্তর বিলাসপুর জয়দেবপুর গাজীপুর সদর গাজীপুর ১৭০০ এর বিবাহ ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৩৫/১৭

গত২৫/০৮/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ রিতা আক্তার, পিতাঃ ইয়ার মোহাম্মদ ভূঁইয়া, গ্রামঃ+ পোঃ বিষ্ণুপুর, থানাঃ বিজয়নগর, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর সাথে মোহাম্মদ রায়হান হাজারী, পিতাঃ মোহাম্মদ আহসানউল্লাহ্ গ্রামঃ+পোঃ ঘাটুরা থানাঃ+জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৩৬/১৭

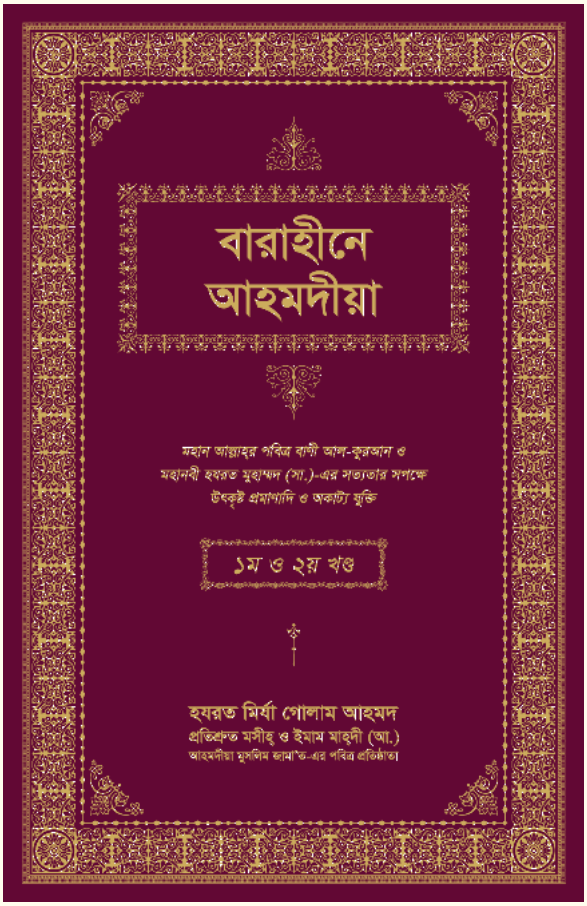

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

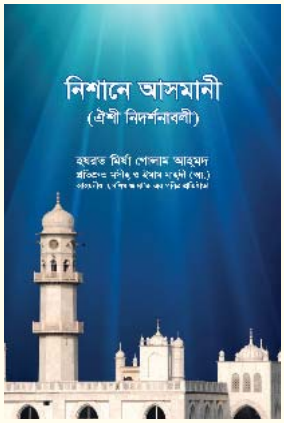

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

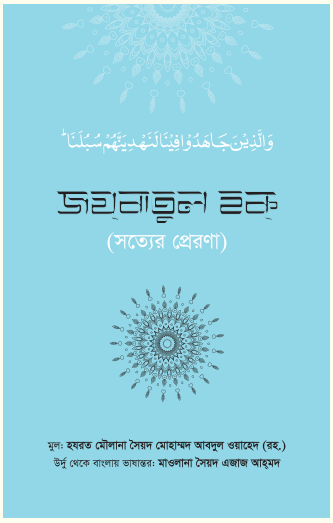

জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 80 | 6th & 7th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th October, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

একটু পড়েই দেখি-

"যারা খাবারের বিলটা সবসময়ই নিজে দিতে চায়, তার মানে এই নয় যে, তার টাকা উপচে পড়ছে। এর কারণ সে টাকার চেয়ে বন্ধুত্বকে বড় করে দেখে।"

"যারা আগে ভাগেই কাজ করে ফেলে, এর মানে সে বোকা নয়, আসলে তার দায়িত্বজ্ঞান রয়েছে।"

"যারা ঝগড়া বা বাক-বিতন্ডার পরে আগে মাফ চেয়ে নেয়, সে-ই ভুল ছিল এমনটি নয় বরঞ্চ সে চারপাশের মানুষকে মূল্যায়ন করে।"

"তোমাকে যে সাহায্য করতে চায় সে তোমার কাছে কিছু আশা করে না বরং একজন প্রকৃত বন্ধু মনে করে।"

"কেউ আপনাকে প্রায়ই টেক্সট করে তার মানে এটা নয় যে, তার কোন কাজ নেই, আসলে সে আপনাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে।"

"একদিন আমরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো, কিন্তু আমাদের আচরণ ও ভালোবাসাগুলো মানুষের হৃদয়ে থেকে যাবে। কেউ না কেউ স্মরণ করবে, এ হচ্ছে সেই মানুষ যার সাথে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু সময় কাটিয়েছি।"

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫
মোবাইলঃ ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com